Contents

জাকির নায়েক লেকচার সিরিজ-৩৫

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী?

What Is The Purpose Of Our Life

মূল
ডা. জাকির নায়েক
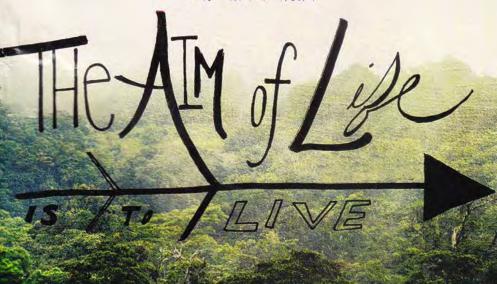
পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication

What is the puepose of our life

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী?

মূল

ডা. জাকির নায়েক

সংকলনে

এ কে এম নাঈমুল ইসলাম
প্রধান সম্পাদক : কারেন্ট নিউজ

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রতিপালক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সুবহানাহূ ওয়া তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যিনি ব্যতীত প্রকৃত সত্য কোন ইলাহ নেই। অজস্র সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (স), তাঁর সহধর্মিণী ও সাহাবীগণের ওপর।

মূল লেকচারের নাম "What is the puepose of our life" বা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? বিষয়ে দেয়া ডা. জাকির নায়েকের এ বক্তব্যটি বর্তমানে উদ্দেশ্যহীন জীবন পরিচালনায় অভ্যস্থ মুসলিমদের অবস্থান বিবেচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য বক্তব্যের মতো তাঁর এ বক্তব্যেও যেমন রয়েছে হৃদয়স্পর্শী উদ্দীপনা তেমনি রয়েছে চলার পথের সঠিক পাথেয় ও প্রেরণা। কারণ, উদ্দেহীন জীবন আর হাল বিহীন নৌকার সঠিক গন্তব্যে পৌঁছা দূরহ-ই শুধু নয়; অসম্ভবও বটে।

মানুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা কোনো উদ্দেশ্য ব্যতীত সৃষ্টি করেন নি। নিশ্চয়ই মানব সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থ : আমি জ্বীন এবং মানুষকে এই কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ তার জীবনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিচালনা করতে পারে না। বক্ষমান লেকচারে ডা. জাকির নায়েক পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন।

একটি কথা সবারই জানা দরকার যে, লিখিত বক্তৃতা ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বক্তৃতার ক্ষেত্রে বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

প্রায় কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ এ ধরণের বক্তৃতা প্রসঙ্গ খুব দ্রুতই পরিবর্তিত হয়। যাহোক এ বইয়ের আলোচিত বক্তব্যটিকে বিষয়ানুপাতে সহজেই বোঝার সুবিধার্থে ছোট-বড় অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অনুবাদ কর্ম আসলেই কঠিন একটি কাজ। তারপরও বাংলা ভাষা-ভাষী জনগণের নিকট ডা. জাকির নায়েকের লেকচার তুলে ধরতে ক্ষুদ্র এ প্রয়াসে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সহৃদয় পাঠকমহলের পরামর্শকে সাদরে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। আপনাদের দু'আ কামনায়।

সূচিপত্র

Contents

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য

– ডা. জাকির নায়েক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ـ .... رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ـ

আলহামদুলিল্লাহ। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন। আম্মাবাদ। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিআ'বুদুন। আল্লাযি খালাকাল মাওতা ওয়াল হায়াতা লি ইয়াবলুয়াকুম আহসানু আমালা। রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী ওয়াহলুল উকদাতাম মিনলীসানী ইয়াফকাহু কাউলী।

শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞগণ, বক্তাগণ, শ্রদ্ধেয় অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় গুরুজনেরা, প্রিয় ভাই ও বোনেরা এবং সেই লাখ লাখ দর্শক, যারা টিভিতে এই অনুষ্ঠান দেখছেন- আপনাদের স্বাগত জানাই ইসলামিক সম্ভাষণে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আল্লাহ তায়ালার দয়া, শান্তি এবং রহমত আপনাদের সবার ওপরে বর্ষিত হোক। আজকে আমাদের ১০ দিনব্যাপী কনফারেন্সের শেষ দিনে আমি আপনাদের সামনে শেষ লেকচারটা দিচ্ছি।

আজকের লেকচারের টপিক হলো– আমাদের তথা মানুষের এই জীবনের উদ্দেশ্যটা কী?

আমাদের মধ্যে কতজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করেছেন যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী। আমাদের মধ্যে কজন আছেন, যারা চিন্তা-ভাবনা করেছেন এ ব্যাপারে যে, আমাদের এই অস্তিত্বের উদ্দেশ্যটা কী। আমরা এখানে কী করছি? এখানে কেন এসেছি? আসুন, আমরা এই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখি।

ক'জন লোক জীবনের উদ্দেশ্য জানে?

আমি দর্শকদের অনুরোধ করবো, আপনাদের মধ্যে কেউ যদি কখনও একটা চিন্তা করে থাকেন যে, আপনার জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? তাহলে দয়া করে হাত তুলুন। আমি জানতে চাচ্ছি যে, এখানে দর্শকদের মাঝে ক'জন এটা নিয়ে চিন্তা করেছেন যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, ১৫/২০ জন হাত তুলেছেন; খুব বেশি হলে ১০০জন হাত উঠিয়েছেন। এখানে প্রায় ১ লাখ মানুষ আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী– এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার লোকসংখ্যা ০.১ শতাংশেরও কম। অনেকেই হয়তো হাত তুলতে লজ্জা পেয়েছেন, আর তাই হাত তুলেননি। তারপরও আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মধ্যে ০.১ শতাংকের কম মানুষ এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করে যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী?

এখন কথা হলো- আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? এটা জানা কি খুব জরুরি? আমি আপনাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আর সেটা হলো- মনে করুন একটি লোক হাঁটতে হাঁটতে এক মোড়ে আসলো। তখন সে অন্য আরেক জনকে জিজ্ঞাসা করলো "এই রাস্তাটা কোন দিকে গিয়েছে, ভাই?" পথিক তাকে বললো- "আপনি কোথায় যেতে চান?" লোকটি বললো- "যে কোনো জায়গায়।" তখন পথিক বলবে- "যে কোনো পথে যান কোনো সমস্যা হবে না।"

এখানে এই লোকটার কোনো উদ্দেশ্য নেই। লোকটা যেসব কাজ করে, তার সেই কাজগুলো কোনোরকম পার্থক্য সৃষ্টি করে না; কারণ তার কোনো গন্তব্য নেই। আমাদের মধ্যে অনেকে ঠিক এভাবেই জীবন-যাপন করছে।

জীবনের উদ্দেশ্যের রকমফের

আপনাদের আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজন বিল্ডার (স্থপতি) একটি বিল্ডিং বানানো শুরু করলো। বিল্ডিংয়ের ভিত তৈরির জন্য সে মাটিতে বড় একটি গর্ত তৈরি করলো। এ সময় তাকে প্রশ্ন করা হলো- "আপনার এই বিল্ডিংটা কত তলা পর্যন্ত হবে?" সে বললো- "আমি জানি না।" প্রশ্ন করা হলো- "বিল্ডিংটা কত স্কয়ার ফিট জুড়ে তৈরি করা হচ্ছে?" সে বললো- "এটা নিয়ে চিন্তাই করিনি।" আসলে সেই বিল্ডারের কোনো উদ্দেশ্যই নেই।

একবার এক লোক তার প্রতিবেশীকে বললো- "আপনার কুকুরটা সবসময় গাড়ির পিছনে ধাওয়া করে। ভাবছি এই কুকুরটা কখনও কি কোনো গাড়িকে ধরতে পারবে?" প্রতিবেশী উত্তর দিল– "কোনো গাড়িকে ধরতে পারবে কি না সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না, বরং আমি ভাবছি গাড়িটা ধরতে পারলে সে তখন

কী করবে।" যে লোকটা বলছে, কুকুর গাড়িটা ধরতে পারবে কি না সে কিন্তু বুঝতে পারছে না। আর প্রতিবেশী, যে কুকুরটার মালিক; সে কিন্তু বুঝতে পারছে যে, কুকুর যদি গাড়িটাকে ধরতে পারে তারপর সে কী করবে; সে বুঝতে পারছে যে, এখানে কুকুরটার উদ্দেশ্যটা কী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের অনেকেই আমাদের জীবনটাকে এইভাবে পার করে দিচ্ছি; এই কুকুরটার মতোই।

উদ্দেশ্যহীন জীবন

লোকজন গ্রাজুয়েশান করে। তাদের জিজ্ঞেস করবেন, "আপনি গ্রাজুয়েশন করছেন কেন?" তারা আসলে কারণটা জানেনা। কারণ হলো, এই যে তারা গ্রাজুয়েশন করতে যায়; গ্রাজুয়েশন করে আপনি কী করবেন? সে বললো "আমি জানি না।" আমাদের বেশিরভাগই জীবনটা পার করছি গন্তব্য ছাড়া লোকটার মতো অথবা কুকুরটার মতো, যে একটা গাড়িটা ধরতে পিছনে পিছনে ছুটছে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই।

অনুকরণপ্রিয় মানুষ

আমাদের অনেকেই না বুঝেই অন্যের উদ্দেশ্যকে নকল করি। কোনো ছাত্রকে আপনি প্রশ্ন করবেন "আপনি কমার্স পড়ছেন কেন?" সে উত্তর দিবে, "কারণ আমার বন্ধুও কমার্স পড়ছে।" এছাড়া আবার অনেকেই অভিনেতা-অভিনেত্রী বা বিভিন্ন মডেলকে নকল করার চেষ্টা করে। অনেকেই এটা না বুঝেই করে।

একবার এক লোক গ্রাম থেকে মুম্বাইতে চলে আসলো বড়লোক হওয়ার জন্য। তাকে একবার প্রশ্ন করা হলো- "আপনি মুম্বাইতে আসলেন কেন?" সে তখন বললো- "আমি হিন্দি সিনেমায় দেখেছি অমিতাভ বচ্চনকে, সে খুব গরিব ছিল, তারপর মুম্বাইতে এসে একরাতের মধ্যে অনেক বড়লোক হয়ে গেল।" এই জন্য আপনারা প্রায়ই দেখবেন, মুম্বাইয়ে আশেপাশের বহু এলাকা থেকে মুম্বাইতে চলে আসে, যাতে একরাতে বড়লোক হতে পারে। এই কারণে আমরা দেখতে পাই মুম্বাইতে বস্তির সংখ্যাও খুব দ্রুত বাড়ছে।

অনেক সময় আপনারা দেখবেন, অভিনেতা আর মডেলরা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়। তারা বিভিন্ন পণ্যের মার্কেটিং করে। একবার আমার পরিচিত একজন একটা নতুন গাড়ি কিনলো হুন্দাই আইটেমের। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো– "আপনি হুন্দাই আইটেমের গাড়ি পছন্দ করলেন কেন?" সে বললো- "আমার প্রিয় অভিনেতা শাহরুখ খান; আর তার একটা হুন্দাই গাড়ি আছে; এজন্য আমি এই হুন্দাই আইটেম গাড়ি পছন্দ করেছি।"

আমি জানি না, অভিনেতা শাহরুখ খান ওই হুন্দাই আইটেম গাড়িতে একদিন ছাড়া আর কোনো দিন বসেছেন কিনা। সে চালায় মার্সিডিজ অথবা বিআইডাব্লিউ অথবা এরকম কিছু। আমার সন্দেহ তার আসলে হুন্দাই আইটেম আছে কি-না।

শাহরুক খান মডেল হয়েছেন ট্যাগ হিয়ার ঘড়ির। সেটা বিখ্যাত ঘড়ি, সন্দেহ নেই। এখন শাহরুখ খানের অনেক ভক্তই ট্যাগ হিয়ার ঘড়ি ব্যবহার করছে। আমি জানি না শাহরুখ খানের অভিনয়ের সাথে এই ট্যাগ হিয়ারের সম্পর্কটা কী। ট্যাগের এই ঘড়িটা তাকে কি অভিনয় করতে সাহায্য করেছে? আমার তো মনে হয় শাহরুখ খান বিখ্যাত হওয়ার আগে ঘড়িটার দিকে তাকিয়েও দেখেননি বা ব্যবহার করেননি।

এরকম বিভিন্ন মিডিয়ায় পণ্যের মার্কেটিং করা হয়; আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা অন্য মানুষকে নকল করার চেষ্টা করি। আর সেটা বেশিরভাগ সময় কিছু না বুঝেই করি।

উদ্দেশ্যহীন কাজের পরিণতি

মনে করুন, একজন শিল্পপতি একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি করলো। তাকে প্রশ্ন করা হলো– "আপনি এই টেক্সটাইল ফ্যাক্টরি করলেন কেন?" শিল্পপতি উত্তর দিল– "আমি খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি, টেক্সটাইল ব্যবসায় অনেক বেশি লাভ করা যায়।" তাকে প্রশ্ন করা হলো- "আপনার কাছে কি এ ব্যাপারে ভালো কোনো রিপোর্ট আছে?" সে বললো-"না।" তাকে বলা হলো- "ব্যবসা দেখাশুনার জন্য কি কাউকে ঠিক করেছেন বা সেই কোম্পানির জন্য কি কাউকে এক্সিকিউটিভ বানিয়েছেন?" সে বললো-"না।" তাকে প্রশ্ন করা হলো- "আপনি এখানে কত পার্সেন্ট লাভ করতে চান?" সে বললো- "আমি জানি না।" তাকে প্রশ্ন করা হলো- "আপনি টেক্সটাইল পণ্য বিক্রি করবেন কোথায়?" সে বললো- "আমি জানি না।" আপনাদের কি মনে হয়- এই শিল্পপতি টেক্সটাইল ব্যবসায় কোনো লাভ করতে পারবে? প্রশ্নই আসে না।

তারপর ধরুন, আর একজন লোক, যার কোনো উদ্দেশ্য আছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে- "পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী হওয়া।" এজন্য সে কী করলো? সে প্রথম মানব আদম (আ) থেকে শুরু বর্তমান সময় পর্যন্ত সব ইতিহাস পড়লো। সে সবকিছু পড়ে জানতে পারলো যে, পৃথিবীর মধ্যে এ পর্যন্ত অতিবাহিত সময়ের সবচেয়ে সেরা বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। আর এ কথাটি সঠিক। এটা জানার পর লোকটা কী করলো? সে আইজ্যাক নিউটনের মতো হওয়ার জন্য মাথার চুল লম্বা রাখলো। অর্থাৎ আইজ্যাক নিউটনের মতো বাবরি। তারপর নিউটনের মতো

করে সে জামাকাপড় পড়তে শুরু করলো। সেই লোক কি নিউটনের মতো বিজ্ঞানী হতে পারবে? এই লোকের একটি উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু তার প্ল্যানিংটা ভুল। একটি প্ল্যান অবশ্য তার ঠিক যে, সে বিজ্ঞানীদের নিয়ে পড়াশুনা করেছে। তবে তার পুরো প্ল্যানিংটা ভুল।

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাই জীবনের উদ্দেশ্য

এবার মূল প্রশ্নে আসি যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? পৃথিবীতে এই যে, আমাদের অস্তিত্ব; এটার উদ্দেশ্যটা কী? আপনাদের কী মনে হয়? কে এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে পারবেন যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? কে সে? ডা. জাকির নায়েক? অবশ্যই এর উত্তর হবে, না। ডা. জাকির নায়েক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না। তাহলে কি বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ? এখানেও উত্তর হবে, না; বিজ্ঞানীরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। তাহলে কি দার্শনিকরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন? এখানেই সেই একই উত্তর যে, না; দার্শনিকরাও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নন।

এই প্রশ্নটার সবচেয়ে সেরা উত্তর যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারবেন আমাদের স্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই উত্তর দিতে পারবেন যে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী।

আমার লেকচারের শুরুতে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম। সেটা হচ্ছে সূরা যারিয়াতের ৫৬ নম্বর আয়াত। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থ : আমি জ্বীন এবং মানুষকে এই কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আমার ইবাদত করে। (সূরা যারিয়াত : আয়াত-৫৬)

আমি জ্বীন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। এখানে যে আরবি শব্দটি আছে সেটা اِبَدَةٌ (ইবাদাহ)। এর মূল আরবি শব্দ اَبَدَ (আবদ)। যার অর্থ ভৃত্য অথবা দাস। اِبَدَةٌ (ইবাদাহ) অর্থ- সেবা করা, আনুগত্য করা, অনুগত হয়ে আত্মসমর্পণ করা। এককথায় ইবাদাহ মানে উপাসনা করা।

অথবা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশগুলো মেনে চলা, ঈশ্বরের নির্দেশগুলো মেনে চলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে যে কাজগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেগুলো যদি মেনে চলি, তাহলে সেটাই হবে ইবাদাহ, সেটাই হবে উপাসনা।

যেমন ধরুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন, তোমরা পাঁচটি স্তম্ভ মেনে চলবে। যদি আপনি তাওহীদে বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তাহলে ইবাদত করছেন, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তাহলেও আপনি ইবাদত করছেন, আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করছেন। যদি আপনি যাকাত দেন; যেটা বাধ্যতামূলক; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি সিয়াম পালন করেন, তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের সাহায্য করো। যেটা বলা হয়েছে সূরা মাউনে। এটা করলেও আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা হবে।

যদি আপনি সেই কাজগুলো থেকে বিরত থাকেন, যা করতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিষেধ করেছেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি অ্যালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি শুকরের মাংস না খান; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। যদি চুরি করা, প্রতারণা করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করছেন। এককথায় আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশগুলো মেনে চলেন, আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন; তাহলেও আপনি আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করছেন।

মানুষের সব কাজ দু'ধরনের

আর মানুষের সব কাজকে ইবাদতের ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়, যদি দুটি শর্ত মেনে চলেন।

১. আমরা এই কাজগুলো করবো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

২. যে কাজ করবেন সেটা অবশ্যই সুন্নাহ অনুযায়ী করবেন। যেভাবে আমাদের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) করে গেছেন।

যদি সব কাজে এই দুটি শর্ত মেনে চলেন, তাহলে আপনার সব ধরনের কাজকেই ইবাদত বা উপাসনা বলে গণ্য করা যেতে পারে।

যখনই আপনি কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন, সেই যন্ত্রপাতির সাথে একটা ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল থাকে। যদি মানুষকে এভাবে কোনো যন্ত্র বা মেশিন বলেন, তাহলে আপনার মানবেন যে, মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জটিল মেশিন। আপনাদের কি মনে হয় না যে, এই মানুষ নামক মেশিনেরও একটা ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল দরকার?

কুরআন মানব জাতির ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল

মানবজাতির জন্য সর্বশেষ আর চূড়ান্ত ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল হচ্ছে- "পবিত্র কুরআন"। পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ আর চূড়ান্ত আসমানী কিতাব। এটি নাযিল হয়েছে, সর্বশেষ আর চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। এটাই হলো মানব জাতির জন্য সর্বশেষ আর চূড়ান্ত ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়াল। এই পবিত্র কুরআন তথা মানব জাতির ইন্সট্যাকশান ম্যানুয়ালে বলা হয়েছে, মানুষ কোন কাজগুলো করবে আর কোন কাজগুলো তারা করবে না।

অনেকেই এভাবে প্রশ্ন করে যে, ঈশ্বর কেন চাইলেন যে, আমরা তাঁর ইবাদত করি? এটা না হলে কি কিতাব চলবে না? কেন ইশ্বরের প্রশংসা করতে হবে? আল্লাহ আকবার আল্লাহ সর্বশক্তিমান। মহান ঈশ্বরের কি প্রশংসা না হলে চলবে না?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ـ

অর্থ : হে মানুষ জাতি! তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ সকল অভাব থেকে মুক্ত; সকল প্রশংসা তাঁরই। (সূরা ফাতির : আয়াত-১৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ইবাদত আর প্রশংসা করতে বলেন; এটা কিন্তু তাঁর উপকারের জন্য নয়; বরং এতে উপকারটা আমাদেরই। আমরা যখন বলি আল্লাহু আকবার; একে আল্লাহর কিছু আসে যায় না; তিনি এমনিতেই সর্বশক্তিমান। আপনি আল্লাহ আকবার বলেন আর না বলেন, তারপরও আল্লাহ সর্বশক্তিমানই থাকবেন। এতে আল্লাহ তায়ালার কিছু যাবে

আসবে না। তবে আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রশংসা করতে বলেন, তার কারণ- তিনি মানুষের সাইকোলজিটা জানেন। আমরা মানুষরা যখনই কারো প্রশংসা করি, আমরা তখন স্বাভাবিকভাবে তার উপদেশগুলো মেনে চলি।

যেমন ধরুন, আপনার মায়ের হার্ট অ্যাটাক করলো। তখন সাধারণ একজন লোক এসে আপনাকে বেশ কিছু উপদেশ দিলো। আপনি কি তার কথা শুনবেন, নাকি সেই লোকের কথা শুনবেন, যে লোক পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো হার্ট বিশেষজ্ঞ? একজন সাধারণ লোকের হার্ট সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই; অন্যদিকে একজন হার্ট বিশেষজ্ঞ জানেন, হার্টের কোন সমস্যার কারণে কী হয়। এমতাবস্থায় আপনি একজন সাধারণ লোকের উপদেশ মানবেন, নাকি হার্ট বিশেষজ্ঞের উপদেশ মানবেন?

খুবই স্বাভাবিক, আপনি যেহেতু জানেন হার্ট বিষয়ে সেই ডাক্তার খুবই বিখ্যাত, সবাই তার প্রশংসা করে, তাই আপনার কাছেও তার কথাগুলোই সঠিক বলে মনে হবে। একইভাবে আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান, আমরা যেন তাঁর প্রশংসা করি। তিনি সবচেয়ে মহান, আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, আল্লাহ্ সবচেয়ে জ্ঞানী।

এতে করে আমরা যখনই বলি যে, আল্লাহ্ সবচেয়ে জ্ঞানী, তাই তিনি যে আদেশগুলো দেন, সেগুলো মেনে চলারও চেষ্টা করি। যদি আমরা না মানি যে, তিনি সবচেয়ে জ্ঞানী, তিনি সবচেয়ে মহান, তাহলে তাঁর কথাগুলো মেনে চলার সম্ভাবনা কম। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান আমরা যেন তাঁর ইবাদত করি, তাঁর প্রশংসা করি। আর এতে যে আল্লাহর উপকার হচ্ছে তা নয়; বরং আমাদেরই উপকার হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিরে উল্লেখ করা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ـ

অর্থ : হে মানুষ জাতি! তোমরা তো আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ সকল অভাব থেকে মুক্ত; সকল প্রশংসা তাঁরই। (সূরা ফাতির- আয়াত : ১৫)

মানুষ আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা

আপনাদের আর একটি উদাহরণ দিই। মনে করুন একটি দম্পতি, কয়েক বছর আগে যাদের বিয়ে হয়েছে। তাদের কোনো সন্তান নেই। এরকম হলে বেশিরভাগ দম্পতিরই খারাপ লাগে। অন্যদিকে আর এক দম্পতিও তাদের পাশে আছে, যাদের একটি সন্তান আছে। তারা সন্তানকে অনেক যত্নের সাথে বড় করছে। তারপর যখন সেই সন্তানের বয়স ১৫/১৬ বছর হলো, তখন সে মারা গেল। এমতাবস্থায় এই দম্পতিও খুব কষ্ট পাবে। প্রথম যে দম্পতি, যাদের কোনো সন্তান নেই, তাদেরও কষ্ট লাগে। কিন্তু দ্বিতীয় যে দম্পতি, যাদের সন্তান ছিল, তারা তাদের সন্তানকে বড় করেছিল এবং ১৫/১৬ বছর বয়সে সেই সন্তান মারা গেল। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় দম্পতির কষ্ট লাগবে আরো বেশি।

এরপর ধরুন আরো এক দম্পতি, তাদের সন্তান আছে। তারা সেই সন্তানের অনেক যত্ন নিল, অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন-পালন করলো। সেই সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলো, তখন সে তার বাবা-মায়ের খোঁজ নেয় না, সে বাবা-মায়ের যত্ন করে না। এই ধরনের সন্তানকে আপনারা কী বলবেন? নিশ্চয় আপনারা তাকে বলবেন অমানুষ, অন্যায়কারী আর অকৃতজ্ঞ। আপনারা সবাই মানবেন- যদি আপনার বাবা-মা আপনাকে ভালোবাসার সাথে যত্ন নিয়ে বড় করে, আপনাকে স্নেহের সাথে লালন-পালন করে, আপনাকে যত্নের সাথে বড় করে তোলে; এরপর আপনি বড় হয়ে তাদেরকে ডাকেন না, তাদের কথায় কর্ণপাত করেন না, তাদের কথা চিন্তা করেন না; এমতাবস্থায় নিশ্চয় এমন সন্তানকে বলা হবে অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ, অমানুষ। যদি একথাটা মেনে নেন, তাহলে সেইসব মানুষকে আপনার কী বলবেন, যারা স্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞ?

আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা শুধু আমাদেরই সৃষ্টি করেননি, আমাদের বাবা-মাকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের কি মনে হয় না যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত? আমাদের কি তাঁর প্রতি অনুগত থাকা উচিত নয়? আমাদের মধ্যে কতজন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে তাঁর মহানুভবতা, তাঁর রহমত, তাঁর দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই?

আমাদের স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দিয়েছেন আমাদের জীবন, দিয়েছেন এই পৃথিবীর সব আশির্বাদ, খাদ্য, জামা-কাপড়, বাসস্থান। একবার চিন্তা করুন, আমরা যদি কয়েকদিন পানি না পান করি, তাহলে আমরা মারা যাব। আমাদের মধ্যে ক'জন এই সুপেয় পানির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন? এছাড়াও ভেবে দেখুন- আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই তখন যদি বাতাস না পাই, মাত্র

Contents

কয়েক মিনিট যদি বাতাস গ্রহণ না করতে পারি তখন আমাদের কী হবে? তাহলে আমরা মারা যাব। আমাদের মধ্যে ক'জন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে এই বাতাসের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন? বলুন কতজন ধন্যবাদ জানিয়েছেন? আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে আদৌ ধন্যবাদ জানিয়েছি কি?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ـ

অর্থ : তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অনুগ্রহ বর্ণনা করলে তার সংখ্যা গণনা করতে পারবে না। আর মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম ও অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম : আয়াত-৩৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ـ

অর্থ : মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

(সূরা আদিয়াত : আয়াত-৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই কথাটা অনেক স্থানেই বলেছেন যে, মানুষ অবশ্যই তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা চান যে, আমরা তাঁর ইবাদত করি, তাঁর প্রশংসা করি। এতে তাঁর কোনো উপকার হবে না; বরং উপকার হবে আমাদেরই, মানুষের উপকার হবে। চিন্তা করুন- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এটা জানেন যে, আমরা যদি তাঁর নির্দেশ মেনে চলি তাহলে আমাদের উপকার হবে এবং তিনিও খুশি হবেন।

যেমন ধরুন, একজন ডাক্তার, যিনি গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন। এখন একজন রোগী যদি ডাক্তারের পরামর্শ না শোনে তাহলে ডাক্তারের কেমন লাগবে? আপনি যদি ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলেন, তাহলে ডাক্তারের কোনো উপকার হবে না; সেতো এটা বিনামূল্যে করছে। উপকার হবে আপনার। আপনি যদি তার পরামর্শ মেনে চলেন, তাহলে ডাক্তার এই ভেবে খুশি হবেন যে, যাক আমার রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পৃথিবীর সব ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি উপকারী। যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদত করেন, তাঁর

নির্দেশগুলো মেনে চলেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা খুশি হন। কারণ যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা করেন, তাঁর নির্দেশগুলো মেনে চলেন, তখন উপকার তাঁর সৃষ্টির, এতে উপকার হবে মানুষের; আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাও সন্তুষ্ট হবেন। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা করলে তাঁর কোনো উপকার হবে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রশংসা করলে উপকার হবে মানুষের, উপকার হবে সৃষ্টির।

আপনি যখনই কোনো ভুল করে, পাপ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইবেন, তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন–

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ : (হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের একথা বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা পরায়ণ এবং পরম দয়ালু।

এ সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে- সূরা নিসা'র ২৫ নং আয়াতে, সূরা মায়েদার ৭৪ নং আয়াতে, সূরা হিজরের ৪৯ নং আয়াতে, সূরা নাহলের ১১৯ নং আয়াতে, সূরা জুমারের ৫৩ নং আয়াতে, সূরা বুরুজের ১৪ নং আয়াতে।

এসব স্থানে বলা হয়েছে–

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা পরায়ণ এবং পরম দয়ালু।

যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে না-ও মানেন, যদি তাঁকে অমান্য করেন, এরপরও যখনই আপনি এজন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে ক্ষমা চাইবেন, তখনই তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন, আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার ৪৮ ও ১১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ -

অর্থ : আল্লাহর শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে তিনি শিরক ছাড়া বাকি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ চান, তিনি যে কোনো পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরক করার গুনাহ, আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরিক করার গুনাহ, আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে মানা এসব গুনাহ তিনি ক্ষমা করবেন না। যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করে সেটাই সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে কোনো গুনাহ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরক করার গুনাহ ব্যতীত। আপনি যদি মুশরিক অবস্থায় মারা যান, যদি আপনি শিরক করার পর ক্ষমা না চান, যদি অনুতপ্ত না হন তাহলে আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না। তাহলে যে পাপগুলো থেকে মানুষ জাতিকে দূরে থাকতে হবে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'শিরক' তথা- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে কাউকে শরিক করা বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা।

মানুষ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি

অনেকেই এ ধরনের প্রশ্ন করে যে, আচ্ছা' বুঝলাম, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য; কিন্তু মানুষের মধ্যে স্পেশাল কী আছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন? আমরা মানুষেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সম্পদ, না কি বিশেষ ধরনের সৃষ্টি? মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। মানুষ এবং জ্বীন, এরাই হলো একমাত্র সৃষ্টি যাদের নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার অন্য আর কোনো সৃষ্টির স্বাধীন ইচ্ছা নেই। মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া অন্যরা আল্লাহর আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলে; কারণ তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ মেনে চলা ছাড়া তাদের কোনো উপায়ও নেই।

অন্য দিকে মানুষ এবং জ্বীন, তারা চাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশগুলো মেনে চলতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে আল্লাহ তায়ালার আদেশ না-ও মানতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

অর্থ : নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে। (সূরা ত্বীন : আয়াত-৪)

মানুষ হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সেরা সৃষ্টি। **সুন্দরতম গঠন** পাওয়ার পাশাপাশি আমরা একেবারে আলাদা। আমরা চাইলে **আল্লাহ সুবহানাহু** ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশগুলো মেনে চলতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে তাঁর আদেশ-নির্দেশ না-ও মানতে পারি।

আপনাকে এই স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়ার পর আপনি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশগুলো মেনে চলেন, তাহলে আপনি ফিরিশতাদেরও ওপরে চলে যাবেন। কারণ ফিরিশতাদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছা নেই; তাঁরা সব সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। আপনি স্বাধীন ইচ্ছা পাওয়ার পরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ মেনে চললেন, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন; এতে করে আপনি ফিরিশতাদেরও ওপরে চলে যাবেন। এজন্য আমরা মাঝে মাঝে কোনো ভালো লোককে বুঝাতে গিয়ে বলে থাকি "ও, এ লোকটাতো একেবারে ফিরিশতা"। এটার দুটো পর্যায় হতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- Insult তথা অবজ্ঞা। আর অন্যটা হচ্ছে- আপনাকে যেহেতু স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে, এরপরও আপনি ফিরিশতাদের মতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মেনে চলছেন; তাই আপনি এক্ষেত্রে বড় হয়ে গেলেন।

অন্যদিকে আপনি এই স্বাধীন ইচ্ছা পাওয়ার পর যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশ না মানেন। তাহলে আপনি হবেন শয়তানের ভাই তথা শয়তান।

মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা

তাহলে মানুষের সামনে অপশন আছে দুটি–

১. আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ-নির্দেশগুলো মেনে চলে ফিরিশতাদের ওপরে উঠে যেতে পারেন।

২. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে অমান্য করে শয়তানের মতো হতে পারেন। এখানে বেছে নেওয়ার দায়িত্বটা আপনার।

তারপর এটুকু যদি ভালো করে দেখেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; কারণ আমরা তাঁর সেরা সৃষ্টি। আমাদের কাছে অপশন আছে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে মেনে চলতে পারি অথবা তাঁকে অমান্যও করতে পারি। যদি মেনে চলি তাহলে ফিরিশতাদের চেয়ে বড় হয়ে যাব, আর যদি মেনে না চলি তাহলে শয়তানের মতো হয়ে যাব।

আর এই জীবন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, এটা আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থ : আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

(সূরা মূলক : আয়াত-২)

আমাদের মৃত্যু এবং জীবন আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আমাদের পরীক্ষার জন্য। আমাদের এই জীবন পরকালের জন্য একটি পরীক্ষা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ.

অর্থ : সকল জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই হবে সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-১৮৫)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : নিশ্চিত থাকো আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করবো। তুমি সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীল আর অধ্যাবসায়ীদের। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৫৫)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন পরীক্ষা করার জন্য যে, কে কর্মে উত্তম। আল্লাহ্ অবশ্যই পরীক্ষা নেবেন ভয় আর ক্ষুধা দিয়ে, ধন-সম্পদের ক্ষতি দিয়ে, ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে। আর জীবনে যা উপার্জন করেছেন, সব কিছুর ক্ষতি দিয়ে। একেকজনের পরীক্ষা হবে এক এক ধরনের।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ -

অর্থ : আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। (সূরা যুখরুফ : আয়াত-৩২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন-

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা আনআম : আয়াত-১৬৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে মর্যাদায় অন্যদের ওপর উন্নীত করেছেন; এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনার ওপর অনেক রহম করেছেন। আল্লাহ আপনাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন; তৈরি থাকুন- আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা এবং আল্লাহরই কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা আনফাল : আয়াত-২৮)

তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

(সূরা মুনাফিকুন : আয়াত-৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ـ

অর্থ : মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবুত : আয়াত-২-৩)

আপনি যদি মনে করেন আমি মুসলিম, আমাকে লোকেরা মুসলিম হিসেবে চেনে-জানে, আমার নাম আব্দুর রহমান, আমার নাম আব্দুল্লাহ, আমি ফজলুল হক, এতে করে আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। আপনাকে পরীক্ষা করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অবশ্যই আপনাকে পরীক্ষা করবেন। আর সেই পরীক্ষায় যদি আপনি পাস করেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি জান্নাতে যাবেন।

জান্নাতে যাওয়ার শর্ত

জান্নাতে যেতে হলে মানুষকে কী কী শর্ত পূরণ করতে হবে? এই প্রশ্নটার জবাব দেওয়া আছে পবিত্র কুরআনের সূরা আসরে। সূরা আসরে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَالْعَصْرِ ۙ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

অর্থ : মহাকালের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আসর : আয়াত-১-৩)

জান্নাতে প্রবেশ করার শর্ত হচ্ছে- ঈমান আনা, সৎকর্ম করা, সত্যের উপদেশ দেওয়া, ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। এছাড়া জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব।

৭টি 'P'—এর সমন্বয়

জান্নাতে যেতে হলে একজন লোকের মধ্যে প্রয়োজন ৭টি 'P'-এর সমন্বয়।

কেউ যদি তিনটা P অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে চারটা P পালন করতে হবে।

এক নম্বর P হচ্ছে- Pleasure of Allah. তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

দ্বিতীয় নম্বর P হচ্ছে- পৃথিবীতে Peace তথা শান্তি।

তৃতীয় নম্বর P হচ্ছে- পরকালে Paradise তথা জান্নাত।

এই তিনটা P অর্জন করতে হলে চারটা P পালন করতে হবে।

প্রথম P হচ্ছে- Purity of faith তথা ঈমানে বিশুদ্ধতা।

দ্বিতীয় P হচ্ছে- Piety তথা ধার্মিকতা, ন্যায়নিষ্ঠতা।

তৃতীয় P হচ্ছে- Propagation তথা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা।

চতুর্থ P হচ্ছে- Patience তথা ধৈর্য আর অধ্যাবসায়।

কেউ যদি চায়, পরম করুণাময়ের পুরস্কার অর্জন করবে, পৃথিবীতে শান্তিতে থাকবে আর পরকালে জান্নাতে যাবে; তাহলে থাকতে হবে ঈমান। Purity of faith তথা ঈমানে বিশুদ্ধতা। এরপর থাকবে Piety তথা ধার্মিকতা, ন্যায়নিষ্ঠতা। তারপর থাকতে হবে Propagation তথা মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করা। আর থাকতে হবে Patience মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যাবসায়ের পথে আহ্বান করা।

অর্থাৎ কেউ যদি তিনটা P অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে চারটা P পালন করতে হবে।

আমাদের রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীস আছে। আনাস (রা) বলেছেন, একবার এক লোক রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলো- 'আমি কি আমার উটটাকে বেঁধে রেখে আল্লাহকে বিশ্বাস করবো। নাকি ছেড়ে দিয়ে তারপর আল্লাহকে বিশ্বাস

করবো? নবী করীম ﷺ বললেন- 'আগে উটটাকে বেঁধে রেখে তারপর আল্লাহকে বিশ্বাস করো'। (সুনানে তিরমিযি, খণ্ড : ৪, অধ্যায় ৬০, হাদীস নং ২৫১৭)

ব্যাপারটা এরকম নয় যে, আপনি বললেন- আমি উটটাকে ছেড়ে দিয়ে তারপর আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আপনি ঘরের দরজা খোলা রেখে একথা বলবেন না যে, আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, চোর ঘরে প্রবেশ করবে না। আগে দরজা বন্ধ করুন। এরপর আল্লাহকে বিশ্বাস করুন। আল্লাহকে বিশ্বাস করা জরুরি, তবে আল্লাহর নির্দেশগুলো মেনে চলাও জরুরি। আর সাফল্যের জন্য আল্লাহকে বিশ্বাস করা, তাঁর ওপর ভরসা করা সবচেয়ে জরুরি। সাফল্যের পূর্ব শর্ত হলো আল্লাহর ওপর তায়াক্কুল করা বা ভরসা করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের ওপর জয়ী হওয়ার থাকবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে তোমাদের সাহায্য করবে? মু'মিনরা আল্লাহর ওপর নির্ভর করুক।

(সূরা আল ইমরান; আয়াত : ১৬০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থ : যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেন, আল্লাহ তাদের পথ খুলে দেন। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-৬৯)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সূরা নাহল : আয়াত-৪৩; সূরা আম্বিয়া : আয়াত-৭)

সাফল্যের জন্য প্রথমত আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। তৃতীয়ত, যে জ্ঞানী তাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কাজের সফলতার জন্য প্ল্যান করাটাও জরুরি আবার উদ্দেশ্য ঠিক করাটাও জরুরি। আর আপনারা যখন ম্যানেজমেন্টের পূর্বে লেখা বইগুলো পড়বেন, তখন দেখবেন সেখানে উদ্দেশ্য ঠিক করার জন্য অনেক প্রসেস রয়েছে।

উদ্দেশ্যটা যখন ISLAMIC

তবে আমার মতে, সেরা উদ্দেশ্যটা বা প্ল্যানিংটা হবে ISLAMIC. এখানে আই, এস, এল, এ, এম, আই এবং সি।

এখানে এক নম্বর হচ্ছে- I = ISLAMIC. আপনার উদ্দেশ্যটা হবে ISLAMIC এবং সেটা নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষা অনুযায়ী হতে হবে। আপনার উদ্দেশ্যটা হবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী এবং হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী।

দুই নম্বর হচ্ছে- S = SPECIFIC. অর্থাৎ আপনার উদ্দেশ্যটা হবে নির্দিষ্ট। উল্টাপাল্টা হলে চলবে না। এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এক শিক্ষক তার ছাত্রদের লক্ষ্য দিয়ে তীর মারা শিখাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় শিক্ষক তাদের বললেন পাখিটাকে নিরিখ করো অর্থাৎ Aim করো, যেটা গাছের মগডালে বসে আছে। সবাই ধনুক তাক করলো। এমতাবস্থায় শিক্ষক বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত কেউ তীর ছুড়বে না। শিক্ষক প্রথম ছাত্রকে বললেন, তুমি কি ধনুক তাক করেছো? ছাত্র বললো, হ্যাঁ তাক করেছি। শিক্ষক তাকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো? ছাত্র বললো, আমি দেখছি- জঙ্গল, কিছু গাছপালা আর পাখিটাকেও দেখছি।

শিক্ষক দ্বিতীয় ছাত্রকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো? দ্বিতীয় ছাত্র বললো, আমি দেখছি- গাছ, গাছের কিছু ডালপালা আর পাখিটাকেও দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষক তৃতীয় ছাত্রকে বললেন, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো? তৃতীয় ছাত্র তখন বললো, আমি দেখছি- গাছের কিছু ডালপালা, পাখিটাকে দেখছি আর পাখিটার চোখটাকেও দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষক চতুর্থ ছাত্রকে বললেন, তুমি কি দেখতে

পাচ্ছো? চতুর্থ ছাত্র বললো, স্যার! আমি শুধু পাখির চোখটাকে দেখছি, এছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শিক্ষক তখন চতুর্থ ছাত্রকে বললেন, তুমি এখন তীর মারতে পারো। ছাত্রটি তীর মারার সাথে সাথে তীরটি গিয়ে লাগলো পাখিটার চোখে।

উদ্দেশ্য হতে হবে নির্দিষ্ট, ফোকাস থাকতে হবে। এটা সেই লোকটার মতো হবে না, যার কোনো গন্তব্য নেই। অথবা সেই কুকুরটার মতো যেটি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই গাড়ির পিছনে দৌড়াচ্ছে।

তিন নম্বর হচ্ছে- L = LUCRATIVE অর্থাৎ লাভজনক, উপকারী। এতে আমরা লাভবান হবো পরকালে, আখেরাতে। একই সাথে সেটা হতে পারে পার্থিব জীবনের জন্যও উপকারী। তবে আখেরাতের বিষয়টিই বেশি জরুরি।

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন—

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দাও আর আখেরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। (সূরা বাকারা; আয়াত-২০১)

উদ্দেশ্য হতে হবে LUCRATIVE অর্থাৎ লাভজনক, উপকারী। সেটা আখেরাতের জীবনের জন্য এবং দুনিয়াবী উপকারের জন্যও। সবচেয়ে জরুরি হলো পরকালের জীবন, এরপর হচ্ছে ইহকাল তথা পার্থিব জীবন। এই পৃথিবীর লাভের আশায় আপনারা যেন পরকালের লাভটাকে না হারান।

চার নম্বর হচ্ছে- A = APT অর্থাৎ সঠিক বা যথার্থ। আপনার উদ্দেশ্য হতে হবে সঠিক আর যথার্থ। যথার্থ উদ্দেশ্য ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না।

পাঁচ নম্বর হচ্ছে- M = MEASUREBLE অর্থাৎ পরিমাপ। উদ্দেশ্যটাকে যেন পরিমাপ করা যায়। আর উদ্দেশ্য পরিমাপ করতে গেলে আগে এটা নির্দিষ্ট হতে হবে। উদ্দেশ্যটা নির্দিষ্ট হলেই এটাকে পরিমাপ করা যাবে। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি- ধরুন একজন বিল্ডার বললো, আমি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিংটা বানাতে চাই। উদ্দেশ্যটা এখানে নির্দিষ্ট, আর পরিমাপ করার জন্য সে জরিপ করলো পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং সম্পর্কে। আর সে জানতে পারলো যে, বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং হচ্ছে- দুবাইতে অবস্থিত 'বুর্জ আল

খলিফা'। আর সেটা ৮২৮ মিটার উঁচু, যা নির্দিষ্ট। এখন তাকে এমন একটা বিল্ডিং বানাতে হবে যেটা হবে ৮২৮ মিটারের চেয়ে বেশি উঁচু। এটা নির্দিষ্ট এবং একে পরিমাপও করা যায়। যদি পরিমাপ করা যায়, তাহলে সেটা তদারকিও করা যায় যে, আপনি কতখানি উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছেন।

ছয় নম্বর হচ্ছে- I = INTENTION অর্থাৎ নিয়ত। রাসূল ﷺ বলেছেন-

অর্থ : তোমাদের কাজকে বিচার করা হবে নিয়ত দিয়ে।

(সহীহ বুখারী, খণ্ড : ১; অধ্যায় : ১; হাদীস নং : ১)

নিয়তের কারণেই আপনি পুরস্কার পাবেন। আপনার নিয়ত হবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা। আপনার INTENTION বা নিয়ত এমন হবে না যে, বিখ্যাত হবো, জনপ্রিয় হবে। নিয়ত এ রকম হলে আপনার উদ্দেশ্যটা সঠিক হবে না। যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা, তাহলে অবশ্যই আপনি পরকালে পুরস্কার পাবেন এবং ইনশাল্লাহ আপনি এর জন্য ইহকালেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে পুরস্কার লাভ করবেন।

সাত নম্বর হচ্ছে- C = CONSISTENT অর্থাৎ ধারাবাহিকতা । আপনার উদ্দেশ্যটা হতে হবে ধারাবাহিক। সময় সংক্ষিপ্ত থাকলে ততক্ষণ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। সময় সীমিত না থাকলে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে সারা জীবন। যেমন ধরুন, আপনি ঠিক করলেন, আমি রমযান মাসে প্রতিদিন অন্তত একবার কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবো। অথবা আপনি ঠিক করলেন আমি রমযান মাসে প্রতিদিন ১ পারা করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করবো। আপনি যদি ধারাবাহিকতা ঠিক রাখেন তাহলে রমযানের শেষ দিনে দেখবেন আপনার পবিত্র কুরআন ৩০ পারাই পড়া শেষ হয়েছে।

যদি সময় সীমিত না থাকে, তাহলে আপনি ঠিক করলেন- আমি প্রত্যেক দিন কুরআন তিলাওয়াত করবো। নিয়ত করলেন আমি প্রতিদিন কুরআনের এক বা অর্ধেক পারা তিলাওয়াত করবো। এরপর আপনি প্রতিদিন এক বা অর্ধেক পারা কুরআন তিলাওয়াত করলেন আর এভাবে ধারাবাহিক থেকে গেলেন। ধারাবাহিকতা চলতে থাকলো একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

আমাদের নবী করীম ﷺ বলেছেন-

এক লোক নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো- "আল্লাহ কোন কাজ সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন?" নবী করীম ﷺ বললেন- "আল্লাহ সেই কাজগুলো পছন্দ

করেন, যেগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে; সে কাজটা অনেক ছোটও হতে পারে।" (সহীহ মুসলিম, খণ্ড : ১; অধ্যায় সালাত : ২৭২; হাদীস নং : ১৭১১)

বড় কোনো কাজ একবার করার চেয়ে ছোট কাজ বারবার করা ভালো। যে কাজগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে সেই কাজগুলোর গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি।

তাহলে উদ্দেশ্যটা হতে হবে ইসলামি I-S-L-A-M-I-C. I তে = ISLAMIC. (ইসলামিক), S তে SPECIFIC. বা নির্দিষ্ট, L তে LUCRATIVE বা লাভজনক, A তে APT বা সঠিক, M তে MEASUREBLE বা যেটাকে পরিমাপ করা যায়, I তে INTENTION বা নিয়ত; আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, আর C তে CONSISTENT বা ধারাবাহিকতা।

উইলমার রুডলর সাফল্য

একটা উদাহরণ দিই। আপনারা অনেকেই উইলমার রুডলফ সম্পর্কে জানেন। উইলমা রুডলফ একটি মেয়ে। ছোট বেলা থেকেই সে পোলিও রোগে ভুগছে। ডাক্তাররা চিকিৎসার পর তার পায়ে বেজ লাগিয়ে দিয়ে বললেন যে, সে আর কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। তার মা তখন তাকে উৎসাহ দিল। মা বললো- উইলমার শোন, "তুমি যে কাজটা করতে চাও, ঠিক সেটাই করতে পারবে।" উইলমার তখন ৯ বছর বয়সে পায়ের বেজগুলো খুলে ফেললো। সে চাইলো- সে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এটি তার ইচ্ছা, এইটা তার উদ্দেশ্য। রুডলফ বেজগুলো যখন খুলে ফেলল, তখন তার বয়স মাত্র ৯ বছর। এরপর ১৩ বছর বয়সে জীবনের প্রথমবারের মতো সে একটা রেসে অংশ গ্রহণ করলো আর হেরে গেল। সে সবার শেষে তার দৌড় শেষ করলো আর চলে আসলো।

কিন্তু সে তারপরও ধারাবাহিকভাবে তার সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো। সে বার বার হেরে যাওয়ার পরও তার প্রচেষ্টায় ক্ষ্যান্ত দিল না। এরপর একদিন সে অলিম্পিক গেমসের জন্য কোয়ালিফাইং করলো। তারপর সে এমন ঘটনার জন্ম দিল, যা গল্প বা রূপকথার মতো মনে হলেও আদতে সেটা নয়। সে ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার জন্য কোয়ালিফাইং করে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলো। সে সেই অলিম্পিকে অংশ নিয়ে মহিলাদের ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করলো আর গোল্ড মেডেল পেল। এরপর সে মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়েও গোল্ড মেডেল (স্বর্ণপদক) অর্জন করলো। এরপর সে ৪০০ মিটার রিলে রেসেও গোল্ড মেডেল জয় করে নিল। ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে সে মহিলাদের বিভিন্ন দৌড়ে তিনটি গোল্ড মেডেল জিতে ইতিহাস তৈরি করলো।

প্যারালাইজড, একটি পঙ্গু মেয়ে যার পোলিও হয়েছে আর ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন যে, সে আর নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতেই পারবে না; সে দৌড়ে গোল্ড মেডেল পেয়ে ইতিহাস রচনা করলো। সে ১৯৬০ সালে হয়ে গেল পৃথিবীর দ্রুততম মহিলা।

মূলত প্রথম কাজ হলো উদ্দেশ্য ঠিক করা। এখন উইলমারের উদ্দেশ্যটাকে যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে দেখবেন ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বইগুলোতে বর্ণিত সবগুলো শর্ত সে পূরণ করেছে। আপনারা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের বইগুলো পড়লে জানতে পারবেন; তাই এখানে আমি বিস্তারিত বলছি না। তবে আসুন দেখি, আসল উদ্দেশ্য পূরণে সে কতখানি সফল হয়েছে।

ইসলামিক উদ্দেশ্য পূরণে সে কতখানি সফলতার পরিচয় দিয়েছে? উইলমারে উদ্দেশ্যটা কি ইসলামিক ছিল? উদ্দেশ্যটা কি কুরআন আর সুন্নাহ অনুযায়ী ছিল? আমি তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানি না। তবে এতোটুকো জানি যে, সে মুসলিম ছিল না। আমি জানি না সে এটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করেছিল কি না।

দুই নম্বর, উদ্দেশ্যটা কি নির্দিষ্ট ছিল? এর উত্তর হলো হ্যাঁ, তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ছিল। উইলমার চেয়েছিল সে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম মহিলা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এটা কি LUCRATIVE বা লাভজনক? হ্যাঁ, এটা লাভজনক। সে এটার মাধ্যমে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি পার্থিক উপকারও লাভ করেছে। সে খ্যাতি পেয়েছে, সম্মান পেয়েছে। কিন্তু পরকালের জন্য? আমার মনে হয়, না। সেক্ষেত্রে তার অলিম্পিকের এই গোল্ড মেডেল কোনো কাজে লাগবে না। যদি না সেই গোল্ড মেডেলগুলো আল্লাহর নামে উৎসর্গ করে। A তথা APT. এটা কি সঠিক? হ্যাঁ, এটা সঠিক। M তথা MEASUREBLE. সে কি এটাকে পরিমাপ করতে পেরেছে? হ্যাঁ, সে এটাকে পরিমাপ করতে পেরেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুততম মহিলাকে সে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া ১০০ মিটার বা ২০০ মিটারের এই দৌড় প্রতিযোগিতা, এটার টাইমিং মাপা যায়। সে হয়তো ১১ সেকেন্ডে বা ১০ সেকেন্ডে এটা অতিক্রম করে এই রেকর্ড করেছে। এরপর I তথা INTENTION. তার নিয়ত কী ছিল? যদি তার নিয়ত থাকে খ্যাতি অর্জন করা, তাহলে সে সেটা পেয়েছে। তার নিয়ত কি

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ছিল? আমার মনে হয় না; তার নিয়ত আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা ছিল না। আর C তথা এটার কি CONSISTENT বা ধারাবাহিকতা ছিল? হ্যাঁ, এটার ধারাবাহিকতা ছিল। সে বার বার প্র্যাকটিস করেছে। প্রথমে সে হেরে গেছে; তারপর আস্তে আস্তে সে হয়ে গেল পৃথিবীর দ্রুততম মহিলা।

শেখ আহমদ দিদাতের উদ্দেশ্য

আর একটা উদাহরণ দিই। তুলনা করলে আপনারাও ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এখন উদাহরণ হিসেবে আমি যে মানুষটার কথা বলবো, এই মানুষটা খুবই সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু নিজ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার উপরে। এই মানুষটা আমার জীবনটাকে বদলে দিয়েছেন। তিনি আমাকে শরীরের ডাক্তার থেকে আত্মার ডাক্তার বানিয়েছেন। আমি সিওর যে, আপনারা এই মানুষটাকে চেনেন। তিনি হলেন শেখ আহমেদ দিদাত।

আসুন আমরা তার উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে জানি। শেখ আহমেদ দিদাত, আপনারা যদি তার জীবনী সম্পর্কে জানেন, তাহলে দেখবেন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়েছিলেন মাত্র 'ক্লাস সিক্স' পর্যন্ত। যেহেতু তার পড়াশোনা করার সেই সামর্থ্য ছিল না, তাই তিনি 'ক্লাস সিক্স' পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই মানুষটা একেবারেই সাধারণ। তিনি জন্মগ্রহণ করার সময় তার বাবা ইন্ডিয়া ছেড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমান। তিনি সেখানে সেলসম্যানের চাকরি করতেন। তিনি ফার্নিচারের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করতেন।

এই দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি করা অবস্থায় খ্রিস্টান মিশনারিরা তাকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করতো। তারা তাকে বলতো, ইসলাম একটা বাজে ধর্ম; এটা খুবই নিষ্ঠুর ধর্ম। তারা ইসলামকে আক্রমণ করতো। এভাবে উত্যক্ত হতে হতে তার মনের ভিতরে একটি ইচ্ছা জাগ্রত হলো যে, তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন- "আমি ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের দেওয়া প্রত্যেকটি অভিযোগেরই উত্তর দেব। আমি এই খ্রিস্টান মিশনারিদের একটা যুতসই উত্তর দেব।" চিন্তা করুন, এই সিদ্ধান্তটা এমন একজন মানুষ নিলেন যে কি না মাত্র 'ক্লাস সিক্স' পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন।

তবে তিনি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারপর তিনি একটা বই পেলেন। বইটা পড়ে ছিল এমন একটা রুমে, যা ছিল প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য, চারদিকে শুধু ধুলোবালি। সেখানে তিনি যে বইটা পেলেন তার নাম

'ইজহারুল হক'। বইটির রচয়িতা 'মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কাইরানভি'। এই বইতে শেখ আহমেদ দিদাত তার উদ্দেশ্যের পথনির্দেশ পেলেন।

এভাবেই তিনি খ্রিস্টান মিশনারিদের সেই অভিযোগের জবাব দেওয়ার মিশন শুরু করলেন। আর তিনি চেষ্টা করেছেন দীর্ঘ ৪০ বছর। এরপর তিনি সেই খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের চ্যালেঞ্জ করলেন। চিন্তা করুন, 'ক্লাস সিক্স' পর্যন্ত পাস করা একজন মানুষ ৪০ বছর চেষ্টা করেছেন। তারপর পৃথিবীর বিখ্যাত জ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ করেছেন তাদের উক্তির জবাব দেওয়ার জন্য। আর এভাবেই ১৯৮৬ সালে তিনি বিতর্ক করলেন বিখ্যাত ধর্মযাজক রেভার্নড জিমি সুয়াগার্ট (Reverend Jimmy Swaggart)-এর সাথে।

সেখানে আশির দশকে সুয়াগার্ট ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী, সবচেয়ে বিখ্যাত খ্রিস্টান এলিট ধর্ম যাজক। বিতর্কটা অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েকদিন আগে শেখ আহমেদ দিদাতের এক ভক্ত তাকে এসে বললো- "শেখ আহমেদ দিদাত, আমি আপনার ভক্ত। তবে আমি আপনাকে একটি উপদেশ দেই। এই যে মিস্টার সুয়াগার্ট, লোকটাকে আমি চিনি এবং তার সম্পর্কে জানি। তাকে আমি খুব ভালো করে চিনি। এই লোকটার সাথে আপনি বিতর্ক করবেন না। লোকটা আপনাকে চিবিয়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। চিন্তা করুন, দিদাতের ভক্ত দিদাতকে পরামর্শ দিচ্ছে, আপনি সুয়াগার্টের সাথে বিতর্ক করবেন না, আপনি ওকে চেনেন না, আমি তাকে চিনি। সে আপনাকে চিবিয়ে একেবারে রাস্তায় ফেলে দেবে।

সেই লোকটা ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত, সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মযাজক। সে বিভিন্ন চ্যানেলে বক্তৃতা করতো আর তার বাজেট ছিল প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলার। এটা ছিল শুধু তার টিকে থাকার জন্য। আর শেখ আহমেদ দিদাত, মাশাআল্লাহ! আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তিনি তার প্রস্তুতি নিলেন; আল্লাহ তার পাশে ছিলেন। দিদাত আমেরিকায় গেলেন। সেই খ্রিস্টান মিশনারির নিজের শহরে গেলেন। যে স্থানে তিনি বিখ্যাত, সে স্থানে শেখ আহমেদ দিদাত গমন করে তার সাথে বিতর্ক করলেন। আলহামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর সাহায্যে তিনি টেবিলটা উল্টে দিলেন। তিনি বিতর্কে জয়লাভ করলেন।

চিন্তা করুন, একজন খুব সাধারণ মানুষ, যিনি স্কুলও পাস করেননি; গ্রাজুয়েটতো অনেক দূরের কথা। তিনি পৃথিবীর খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন আর পুরো পৃথিবীর খ্রিস্টান মিশনারিদের সামনে ধর্মপ্রচারের সবচেয়ে বড় মাথা

হয়ে দাড়িয়েছিলেন। মাত্র একজন মানুষ, আহমেদ দিদাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যে পুরো খ্রিস্টান বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

আসুন এবার তাঁর উদ্দেশ্যটাকে দেখি যে, তার উদ্দেশ্যটা ইসলামিক (I-S-L-A-M-I-C) কি না। I তে = ISLAMIC. তার উদ্দেশ্যটা কি ইসলামিক ছিল? সেটা কি কুরআন এবং হাদীস অনুযায়ী ছিল? সেটা কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি জন্য ছিল? এগুলোর উত্তর হবে, হ্যাঁ, তার উদ্দেশ্য সেরকমই ছিল। আর এজন্য তিনি তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছিলেন।

দুই নম্বর, উদ্দেশ্যটা কি SPECIFIC বা নির্দিষ্ট ছিল? হ্যাঁ, উদ্দেশ্যটা নির্দিষ্ট ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান মিশনারিদের করা অভিযোগগুলোর উত্তর দিতে চাই; এটা নির্দিষ্ট। আমি যুতসই উত্তর দিতে চাই। আমি অমুসলিমদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো দূর করে দিতে চাই।

তিন নম্বর, এটা কি LUCRATIVE বা লাভজনক ছিল? হ্যাঁ, তিনি লাভ চেয়েছিলেন আখেরাতে; আর ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাতে জায়গা দেবেন। তবে আখেরাত বা পরকালীন লাভের পাশাপাশি ইহকালেও তার লাভ হয়েছে। আর ক্লাস সিক্স পাস করা এই মানুষটা ১৯৮৬ সালে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা অর্জন করেছিলেন। মানব জাতির জন্য বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৬ সালে তাকে বাদশাহ ফয়সাল অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়। এটা কিন্তু তিনি অ্যাওয়ার্ডের জন্য করেননি। তিনি হয় ১/২ লাখ ডলার পেয়েছিলেন; কিন্তু এটার জন্য তিনি করেননি। তিনি অ্যাওয়ার্ড লাভের উদ্দেশ্যে এটা করেননি; এটা করেছিলেন আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ তাকে পরকালে পুরস্কার দেবেন; ইহকালেও দিয়েছেন।

তারপরে এটা কি APT বা সঠিক ছিল? অবশ্যই সঠিক; আর সঠিক সময়ে। সে সময়ে তার এই কাজটা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা তখন মুসলিমদের সমালোচনা করছে, ইসলাম সম্পর্কে জনমনে ভুল ধারণা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছিল। তখন মুসলিমদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই মানুষটা, শেখ আহমেদ দিদাত, লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে অনুপ্রাণিত করেছেন; এমনকি আমাকেও করেছেন। আমরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর একটা সুযোগ পেয়েছি।

পঞ্চম হচ্ছে সেটা MEASUREBLE বা পরিমাপ করার মতো ছিল? হ্যাঁ পরিমাপ করার মতো ছিল। তিনি কী করেছিলেন? তিনি খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন; আর সেইসব বইও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলো খ্রিস্টান

মিশনারিরা ইসলামের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন। তিনি কুরআন ও ইসলামের ওপর কোনো আঘাত আসলে, কোনো প্রশ্ন আসলে সেগুলোর উত্তর দিতেন। তিনি খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলো ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। বাইবেল অধ্যয়ন করেছেন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সেগুলো প্রয়োগ করেছেন এবং তার ফলাফলও তিনি হাতেনাতে পেয়েছেন। যেগুলো পরিমাপ করা যায়।

এরপর I অর্থাৎ তার INTENTION বা নিয়ত কী ছিল? বিখ্যাত হওয়া তার নিয়ত ছিল না। বাদশাহ ফয়সাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া তার নিয়ত ছিল না। তার নিয়ত ছিল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এরপর C অর্থাৎ তার কাজের কি CONSISTENT বা ধারাবাহিকতা ছিল? হ্যাঁ তার কাজে ধারাবাহিকতা ছিল। চিন্তা করুন, তিনি প্রচেষ্টা করে গেছেন দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে। তাঁর জীবনী পড়লে জানবেন, তার অফিসটা ছিল খুবই ছোটো-খাটো একটি রুম। তিনি একবার বলেছিলেন, এমনকি মাত্র ১ হাজার কপি সাদাকালো লিফলেট ছাপাতে গেলেও আমরা মিটিং করতাম। এখন আমরা ১ হাজার কপি লিফলেট ছাপাতে গেলে মিটিং করি যে, লিফলেট ছাপাতে পারবো কি না? মা-শাআল্লাহ। তার কাজগুলো ছিল ধারাবাহিক। তিনি চেষ্টা করে গেছেন ওই পর্যন্ত যতক্ষণ না উদ্দেশ্য পূরণ হয়।

এখন উইলমার রুডলফ আর শেখ আহমেদ দিদাতের মধ্যে আপনারা যে পার্থক্যটা দেখলেন সেটা হলো- উইলমারের উদ্দেশ্য ছিল অদূরদর্শী, সেটা ছিল পৃথিবীর জন্য। অন্যদিকে শেখ আহমেদ দিদাতের উদ্দেশ্য ছিল 'দূরদর্শী'। আহমেদ দিদাতের উদ্দেশ্য ছিল আখেরাতের জন্য। ইনশাআল্লাহ, মহান আল্লাহ তাকে পরকালে পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহ ইহকালেও তাকে পুরস্কার দিয়েছেন।

জীবনের উদ্দেশ্য যখন অর্থ উপার্জন

আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষেরই জীবনের উদ্দেশ্য কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়। আপনার মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে, তাদের জীবনের উদ্দেশ্যটা কী? তারা যা বলবে, তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে- সবার চিন্তা-ভাবনা, টাকা কামাতে হবে। জীবনকে অন্য যে কোনো উদ্দেশ্য গঠনের চেয়ে টাকা উপার্জন নিয়েই তারা বেশি চিন্তা-ভাবনা করে। তারা কীভাবে কী পরিমাণ উপার্জন করে তার উপর নির্ভর করে জীবনের সবকিছু চালাতে হবে। তারা কী খাবে, কোন ধরনের জামা-কাপড় পরবে, কোথায় থাকবে, কোন স্কুলে পড়বে,

কোন গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি হবে, এর সবকিছু নির্ভর করে উপার্জনের ওপরে। আর এই মানুষগুলো ভাবে যে, এই পৃথিবীতে আমি যদি বেশি টাকা উপার্জন করতে পারি, তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবো।

আপনাদের আমি ফোকাস করার কথা বলেছিলাম। বেশিরভাগ মানুষ কী করে জানেন? তারা ফোকাস করার আগে শূন্যে তীর মারে; তারপর তীরটার চারপাশে একটি টার্গেট রেখে দেয়। সে যে কোনো জায়গায় তীর মারে, যে কোনো কোর্সে গ্রাজুয়েশনে ভর্তি হয়। তারপর যদি তাকে প্রশ্ন করেন, এই কোর্সে ভর্তি হলেন কেন? সে বলবে, এটা নিয়ে তো চিন্তা করিনি! তারপর সে স্পেশালিস্ট হয়, তারপর সুপার স্পেশালিস্ট হয়। এর পর তারা কারণটা তৈরি করে যে, কেন সে এই কোর্সে ভর্তি হয়েছিল। প্রথমে মানুষ চিন্তা করে কত টাকা উপার্জন করবে। এই টাকার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে তারপর ঠিক করে কীভাবে জীবন-যাপন করবে। আমরা বেশিরভাগ মানুষ এই কাজটাই করি; প্রথমে বাতাসে তীর মারি, তারপর চারপাশে টার্গেট রাখি।

মানুষ যাকে গুরুত্ব দেয়

প্রথমে আমাদের ঠিক করতে হবে মূল লক্ষ্য কোনটা। কোন কাজের ওপর ভিত্তি করে জীবনের সবকিছু চলবে। বিভিন্ন মানুষের মূল লক্ষ্যটাও বিভিন্ন রকম হয়। কিছু মানুষ Self-Centered তথা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে, অন্যদের নিয়ে কোনো চিন্তাও করে না। তারা শুধু নিজেদেরকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে; অন্যদেরকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার তাদের সময় হয়ে উঠে না। তারা হচ্ছে-Self-Centered। আর কিছু মানুষ Family Centered তথা নিজের পরিবার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তারা শুধু এটাই চিন্তা করে যে, তার পরিবারের লোকজন ভালো আছে কি না। তারা ফ্যামিলির লোকদের খুশি করার জন্য যে কোনো কিছু করতে পারে; হতে পারে সেটা সঠিক অথবা ভুল; এতে তাদের কিছুই যায় আসে না। তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো ফ্যামিলির লোকদেরকে খুশি করা। অনেকে বাবা-মা কে গুরুত্ব দেয়, অনেকে জীবন সঙ্গীকে তথা স্বামী বা স্ত্রীকে গুরুত্ব দেয়, কেউ বা সন্তান-সন্ততিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কিছু মানুষ তাদের বাবা-মাকে খুশি করার জন্য বিভিন্ন ত্যাগ তিতিক্ষাও স্বীকার করে। তারা বাবা-মার খুশি-অখুশির ওপর ভিত্তি করে নিজেদের জন্য আইন-কানুন বানিয়ে নেয়।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ـ

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪)

তার পরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ج ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ : তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে চায় যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অত:পর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো।
(সূরা লোকমান : আয়াত-১৫)

অর্থাৎ : তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে মেনে চলবে, তাদের ভালোবাসবে; কিন্তু তারা যদি তোমাকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চায়, তোমাদের স্রষ্টার বিরুদ্ধে যেতে বলে, আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যেতে বলে (আল্লাহ্ এবং রাসূল ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদত করতে বলে) তাহলে তোমরা তাদের কথা মানবে না; তবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সদভাবে বসবাস করো।

অনেকে জীবন সঙ্গীকে বেশি গুরুত্ব দেয়। স্বামী অথবা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করাটাই অনেকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ধরুন, একজন লোকের স্ত্রী হয়তো খুব দামী একটা নেকলেস কিনতে চাচ্ছে। কিন্তু লোকটার সেটা কেনার সামর্থ্য নেই। তখন

সে কী করবে? সে তখন ধার করে, ভিক্ষা করে অথবা চুরি করে হলেও স্ত্রীকে সেই নেকলেসটা কিনে দেয়ার চেষ্টা করবে। এখানে জীবনের উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা।

আবার অনেকে সন্তানকে বেশি গুরুত্ব দেয়। সন্তানকে তারা খুশি করতে চায়। এজন্য অনেক সময় তারা হয়তো পড়াশোনা করার জন্য বাইরের দেশে যেতে চায়। সে যে কোর্সে ভর্তি হতে চাচ্ছে, সেটা একেবারেই অর্থহীন; এতে করে তার পরকালে কোনো লাভ হবে না; এমনকি ইহকালেও কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই। তারপরেও যেহেতু ছেলে বিদেশে যেতে চাচ্ছে, এই লোক তার সব সম্পত্তি মর্টগেজ রেখে সেই টাকা দিয়ে ছেলেকে আমেরিকায় পাঠাবে, তারপর বলবে- আমার ছেলে তো আমেরিকায় লেখাপড়া করছে! যেন ছেলেকে পড়াশোনা করার জন্য আমেরিকায় পাঠানোটাই তার উদ্দেশ্য ছিল। দেখতে হবে উদ্দেশ্যটা কী। জীবনের মূল লক্ষ্যটা কী।

কিছু মানুষ Society Centered তথা সমাজকে নিয়ে বেশি চিন্তা-ভাবনা করে। তারা ভাবে, অন্য মানুষ আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে কী ভাবছে এটার গুরুত্বই তার কাছে বেশি। তার পুরো জীবনটা ঘুরতে থাকে সমাজকে কেন্দ্র করে।

মানুষ অন্যের চেয়ে বেশি পেতে চায়

কিছু মানুষ Neighbour Centered তথা প্রতিবেশীকে গুরুত্ব দেয়। সে প্রতিবেশীর সাথে প্রতিযোগিতা করে। এখানে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটা হচ্ছে- "একবার এক ফিরিশতা এক লোকের কাছে এসে বললো- আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট। তুমি যা চাইবে, যা ইচ্ছা করবে, তা-ই আমি পূরণ করে দেব। তবে একটি শর্ত আছে। শর্তটি হচ্ছে তুমি যা চাইবে, তা পাবে কিন্তু তোমার প্রতিবেশী তার দ্বিগুণ পাবে। তখন লোকটি বললো- আমি একটি রোলেক্স ঘড়ি চাই। ফিরিশতা তাকে একটি রোলেক্স ঘড়ি দিলেন; কিন্তু তার প্রতিবেশীকে দিলেন দুটো রোলেক্স।

লোকটা বললো- একটি মার্সিডিজ গাড়ি চাই। ফিরিশতা তাকে একটি মার্সিডিজ গাড়ি দিলেন; কিন্তু তার প্রতিবেশীকে দুটো মার্সিডিজ গাড়ি দিলেন। লোকটা বললো- আমি খুব সুন্দর একটি বাড়ি চাই। ফিরিশতা তাকে সুন্দর একটি বাড়ি দিলেন; কিন্তু সেই বাড়িটার পাশেই প্রতিবেশীর জন্য দুটো সুন্দর বাড়ি তৈরি করে দিলেন। লোকটি তখন বললো- আচ্ছা, এবার আমার শেষ ইচ্ছাটাও পূরণ করে দিন আপনি। ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কী? লোকটি বললো-

আমার একটি চোখ তুলে নেন; যাতে করে আমার একচোখে সব দেখতে হয়।

চিন্তা করুন, সে তার প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবছে; নিজের কথা ভাবছে না। সেটা দেখার বিষয় নয় যে, তার ব্যাপারটা সহজ নাকি জটিল, সে আরামে দিন কাটাচ্ছে নাকি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তার একমাত্র চিন্তা, আমাকে আমার প্রতিবেশীর চেয়ে ভালো থাকতে হবে। আর এই কারণে সে ফিরিশতাকে বললো- আমার একটা চোখ আপনি তুল নেন; তাহলে প্রতিবেশী দুটো চোখই হারাবে।" এভাবেও অনেকে প্রতিবেশীকে গুরুত্ব দেয়। সে দেখতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না সেটা চিন্তা না করে সে ভাবছে, আমার প্রতিবেশীর যদি দুটো চোখই তুলে নেয়া যায়, এক চোখ হারাতে আমার আপত্তি নেই। এখানে প্রতিবেশীই সব।

কিছু মানুষ Friend Centered তথা বন্ধুকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আবার অনেকে Enemy Centered তথা শত্রুকে বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা চিন্তা করে যে, তাদের শত্রু কী করছে। তারা চিন্তা করে করে বের করে যে, শত্রু যদি এটা করে তো আমি ওটা করবো। তারা পুরো সময়টা তথা সারা জীবন ধরেই চিন্তা করে 'আমার শত্রু কী করছে'। এটা আপনারা অনেক স্থানেই দেখতে পাবেন। ব্যবসায়ীরা এমন চিন্তা-ভাবনা করে, রাজনীতিকরাও এমন চিন্তা-ভাবনা করে, ছাত্ররাও করে থাকে এমন চিন্তা-ভাবনা। শত্রু প্ল্যানিং করছে, আমি তার কাউন্টার প্লানিং করবো।

বেশিরভাগ সময়ই তারা চিন্তা করে, কীভাবে শত্রুকে ঠেকানো যায়। এই সব মানুষের উদ্দেশ্যে আমি একটি পরামর্শ দেব; যেটা আমিও মেনে চলি। "কেউ যদি আপনার দিকে পাথর মারে, নিজেকে আপনি এতো উঁচুতে নিয়ে যান, যাতে পাথরটা আপনাকে ছুঁতে না পারে। তাহলে তো প্রতিযোগিতার প্রশ্নই আসে না। শত্রুর বিরুদ্ধে প্ল্যান করার দরকার হবে না।"

আর একটা পরামর্শ দিই। আপনার দিকে যদি কেউ ইট ছুড়ে মারে, তাহলে আপনি সেই ইট দিয়ে নিজের বাড়িটা বানিয়ে ফেলুন। স্কুলে থাকতে আমি 'মার্শাল আর্ট' 'ক্যারাতে' 'জুডো' ইত্যাদি শিখেছিলাম। সেখানে শিখেছিলাম বিশাল একটা লোক আপনাকে ধাক্কা দিলে আপনি কী করবেন? সেই লোকের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনি তাকে ছুড়ে ফেলে দেবেন।

কিছু মানুষ খ্যাতির পিছনে ছুটে বেড়ায়; বিখ্যাত হতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য বিখ্যাত হওয়া। আর এজন্য তারা যে কোনো নিয়ম, যে কোনো আইন-কানুন ভাঙ্গতে পারে। আবার কিছু মানুষ বস্তুবাদী। তারা বস্তুকেই গুরুত্ব দেয়। সবসময়

চিন্তা করে তাদের কত সম্পদ আছে, কেমন খাবার খায় বা কেমন জামা-কাপড় পড়ে। এই ব্যাপারটা ধনী লোকজনের মধ্যে খুবই কমন।

যখন তারা বন্ধুদের সাথে দেখা করে, তারা গল্প শুরু করে দেয়: দোস্ত! তুমি কোন ব্র্যান্ডের ঘড়ি পড়েছ? এটা কি রোলেক্স নাকি ওমেগা? ও এটা রোলেক্স? বেল্ট কেমন? লেদারের নাকি মেটালের বেল্ট? এটা কি লেটেস্ট? ঘড়ির ডায়ালটা কেমন? স্বর্ণ নাকি ডায়মন্ড বসানো? আর এই সব ধনী লোকের ঘড়ি কিন্তু একটা নয়; তাদের অনেকগুলো ঘড়ি থাকে। আর এটা নিয়ে তারা প্ল্যান করে। আচ্ছা এই ঘড়িটা আজ পড়েছি, আগামিকাল বন্ধুদের সাথে দেখা করতে এই ঘড়িটা পড়া যাবে না। তারা কোন অনুষ্ঠানে কোন ঘড়ি পড়বে তা নিয়ে প্ল্যান করে।

তারপর তারা গাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করে। তোমার গাড়িটা কোন ব্র্যান্ডের? বিএমডব্লিউ? মার্সিডিজ? পোরশে? মেটলে? হুন্দাই? এরকম। এভাবেই তারা সময় কাটায়। তারা মনে করে এগুলো তাদের পরিচয়। তারা এগুলো যদি না পড়ে, তাহলে তাদেরকে ধনী হিসেবে মানুষ চিনবে কী করে? যদি সেই মার্সিডিজ বা বিএমডব্লিউ গাড়িতে না চড়ে তাহলে তাদেরকে লোকজন চিনবে কী করে: এটাই যেন তাদের পরিচয়। শহরগুলোতে এই ধরনের মানুষ প্রায়ই দেখা যায়। আর একটু ওপরে গেলে দেখা যায়, আলোচনা হচ্ছে- তোমার ইয়টটা কেমন? তোমার যে জাহাজটা আছে। সেটা কেমন?

আর একটু ওপরে গেলে দেখা যাবে আলোচনা হচ্ছে- তোমার জেট প্লেনটা কেমন? আমার তো একটা জেট প্লেন আছে। এটার ইঞ্জিনটা ঠিকমতো সার্ভিস দেয় কি না।

আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন, আমি আবার এইসবগুলো ব্যাপারে এতো খুঁটিনাটি জানলাম কীভাবে। কারণ, আমার এই পেশা। হোক সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, আমি যে পেশায় আছি এখানে আমি বিভিন্ন পেশার মানুষের সাথে মিশি একেবারে ফকির থেকে রাজা পর্যন্ত। আল্লাহ রহমত করেছেন, ফকির থেকে রাজা পর্যন্ত সব ধরনের মানুষের সাথেই মিশেছি আমি। আর যখনই সুযোগ পেয়েছি, যখনই দেখেছি যে আমার পাশের ব্যক্তিটি বস্তুবাদী; তার কাছে আমি বিষয়টা বলে ফেলেছি। তাদেরকে আমি বলি, আপনার এই ঘড়িটা ১ হাজার ডলার অথবা ১০ হাজার ডলার অথবা ১ লাখ ডলার হতে পারে; আমার ঘড়িটা যেটা আমি পরে আছি, এটার দাম মাত্র ১৪০০ রুপি। অর্থাৎ ৩০ ডলারেরও অনেক কম। এটা অনেকদিন আগে কেনা।

তারপরও আপনার ঘড়ির মতোই এটা সময়টা সঠিক বলে দিচ্ছে। সাধারণ ঘড়ি, দাম মাত্র ১৪০০ রুপি, আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমাকে রহমত করেছেন; আমি যে ব্র্যান্ডের নামগুলো বললাম, এর বেশিরভাগই আমি গিফট পেয়েছি। প্রায় সবগুলো তথা ওমেগা, রোলেক্স ইত্যাদি ঘড়িগুলো আমি গিফট পেয়েছি। আর আমি সবসময় নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশগুলো মেনে চলি বিধায় আমি আমার এই ঘড়িগুলো আমার অন্যান্য কলিগ দাঈদেরকে দিয়েছি, যাতে করে আমি শয়তানের ওয়াসওয়াসা তথা খুতওয়াতুশ শাইত্বান থেকে দূরে থাকতে পারি। এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে যে, আমার হোস্ট প্রাইভেট জেট প্লেন পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রাইভেট জেট প্লেনে আমাকে তার দেশে নিয়ে যাবেন। চিন্তা করুন, মাত্র একজন মানুষের জন্য জেট প্লেনের জ্বালানি খরচ হবে, পাইলটদের বেতন আছে, তারপর এয়ার হোস্টেসদের বেতন, তারপর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার খরচ। সেজন্য আমার হোস্টকে আমি বললাম- আপনি আমার জন্য ইকোনোমি ক্লাসের একটা ব্যবস্থা করে দিন।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আমার ফ্যামিলিকে অনেক রহমত করেছেন। দামি গাড়ি কেনারও সামর্থ্য আছে। আমি প্লেনে ফার্স্ট ক্লাসেও যেতে পারি, আলহামদু লিল্লাহ। তবে আমি দাঈ। তাই হোস্টকে বললাম- এখানে এতো টাকা খরচ করার কোনো দরকার নেই। আপনি আমার জন্য ইকোনোমি ক্লাসের একটা ব্যবস্থা করে দিন; আর বাকী টাকা আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে খরচ করুন। আমার হোস্ট মাশাআল্লাহ! ধনবান ও জ্ঞানী। তিনি বললেন- আমি আমার প্রাইভেট জেট প্লেন পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে আসতে চাচ্ছি, এই কারণে যে, এখানে আল্লাহর একজন দাঈর চেয়ে যোগ্য লোক আর কে আছে? তখন আমি বললাম- এটাই যদি আপনার নিয়ত হয়, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি পুরস্কার পাবেন। তার নিয়ত ছিল আল্লাহর একজন নগণ্য ভৃত্যকে সম্মান দেখানো; আল্লাহ যেন তাকে পুরস্কার দেন।

এখানে আর একটা কথা বলি। আমি কিন্তু আপনাদের বলছি না যে, এইসব বস্তুবাদী জিনিস একেবারে হারাম। অথবা এগুলো সবসময় হারাম। আপনাকে বুঝতে হবে 'আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী?" হারাম হতে পারে, আবার হারাম না-ও হতে পারে।

আমি একটা উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি এক নম্বর ক্যাটাগরিতে পড়েন। তার মানে আপনার এই জিনিসগুলো কেনার সামর্থ্য নেই। এই দামি ঘড়ি, দামি গাড়ি,

দামি বাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই। তারপরও আপনি ভিক্ষা বা ধার করলেন অথবা চুরি করলেন, এরপর সেই দামি ঘড়ি পড়লেন, দামি গাড়িতে চড়লেন; এটাকে বলা হয় ইসরাফ। এটা হারাম নিঃসন্দেহে।

এরপর দ্বিতীয় ক্যাটাগরি লোকজন। যাদেরকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত, আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়। (সূরা আনআম : আয়াত-১৬৫)

আল্লাহ যদি আপনাকে সামর্থ্য দিন; যদি আপনার এই জিনিসগুলো ব্যবহার করার মতো অর্থ থাকে; দামি গাড়ি, দামি বাড়ি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যদি আপনার জীবন ঘোরে অর্থাৎ এগুলো ছাড়া আপনার চলবে না। এগুলো যদি আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য হয় তাহলে এটা হারাম।

এরপর আসুন তৃতীয় ক্যাটাগরিতে। আল্লাহ তাদের সামর্থ্য দিয়েছেন; তাদের জিনিসগুলো আছে; কিন্তু তারা সেগুলোর ওপর নির্ভরশীল নয়। আপনারা জানেন, সুলাইমান আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধনী ছিলেন; কিন্তু এগুলোর ওপর তিনি নির্ভরশীল ছিলেন না। এগুলো থাকার পরে যদি আল্লাহ তায়ালা নির্দেশগুলো আপনি মেনে চলেন; এই জিনিসগুলোর ওপর আপনি নির্ভরশীল না হন; তাহলে এটা 'মুবাহ'। এটা ঐচ্ছিক, হারাম নয়।

তবে সবচেয়ে ভালো চতুর্থ ক্যাটাগরি। আপনার সামর্থ্য আছে, কিন্তু আপনি সেটা কিনছেন না। আপনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেটা প্রয়োগ করছেন না। যেমন আমাদের নবী মুহাম্মদﷺ। তাঁর যে ক্ষমতা ছিল, যে খ্যাতি ছিল, তিনি ইচ্ছা করলে সে সময়ের পৃথিবীর সম্রাট হতে পারতেন। অনেক সম্পদ জমাতে পারতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোনো উপহার পেয়েছেন বেশিরভাগ সময়েই তিনি

সেগুলো সাহাবিদেরকে দিয়ে দিতেন। এমন নয় যে, এগুলো রাখা হারাম। যদি কেউ আপনাকে কোনো কিছু উপহার দেয়, আপনি সেটা রাখতে পারেন; এটা হারাম নয়। তবে নবী মুহাম্মদ ﷺ সেগুলো সাহাবীদেরকে দিয়ে দিতেন। এই ক্যাটাগরির মানুষদেরকে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছেন, তারপরও তারা সেগুলো আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করে।

আমাদের ঠিক করতে হবে যে, আমাদের জীবনের কেন্দ্রটা কী হবে। জীবনের মূল উদ্দেশ্যটা কী? মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেটাই, যা আল্লাহ তায়ালাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়। তার জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ ﷺ। আর সত্যি বলতে আল্লাহকে কেন্দ্র করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, আপনি নিজেকে অবহেলা করবেন বা পরিবারকে অবহেলা করবেন বা সমাজকে অবহেলা করবেন। যদি আল্লাহকে কেন্দ্র করেন, আল্লাহ বলেছেন- নিজের প্রতি যত্ন নাও, রাতের বেলা ঘুমাও। আল্লাহ বলেছেন- তোমার পরিবারের যত্ন নাও।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বাবা-মা সম্পর্কে বলেছেন–

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ـ

অর্থ : তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদের ধমক দিও না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো।

(সূরা বনী ইসরাইল; আয়াত- ২৩)

অর্থাৎ যদি আল্লাহ কেন্দ্রিক হন, তাহলে বাবা-মাকে ভালোবাসতে হবে, তাদের সম্মান করতে হবে, তাদেরকে মেনে চলতে হবে। শুধুমাত্র যখন তারা আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যাবে তখন তাদের কথা মানা যাবে না; কিন্তু তারপরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهُ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَيَّ الْمَصِيْرُ - وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ لا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ز وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ج ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে চায়, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করবো। (সূরা লোকমান : আয়াত-১৪-১৫)

যদি আপনি আল্লাহ কেন্দ্রিক হন, তার মানে এই নয় যে, আপনি স্ত্রীর যত্ন নেবেন না। নবী করীম ﷺ-এর একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেছেন–

বিশ্বাসীদের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ, যারা তাদের পরিবারের যত্ন নেয়; বিশেষ করে স্ত্রীর। (আহমদ-৭৩৯৬)

আল্লাহ কেন্দ্রিকতার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজেকে অবহেলা করবেন বা পরিবারকে অবহেলা করবেন বা সমাজকে অবহেলা করবেন।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ط فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ لا وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ط فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ لا الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ لا الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ لا وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

Contents

অর্থ : তুমি কি তাকে দেখেছ, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিস সাহায্যদানে বিরত থাকে। (সূরা মাউন : আয়াত-১-৭)

আমাদের নবী করীম ﷺ বলেছেন–

"সেই ব্যক্তি মুমিন বা বিশ্বাসী নয়, যে তার নিজের জন্য যেটা কামনা করে অন্য কারো জন্য সেটা কামনা করে না।" (সহীহ বুখারী; খণ্ড : ১; হাদীস নং ১৩)

অর্থাৎ, অন্য মানুষেরও যত্ন নিতে হবে। তাহলে আল্লাহ কেন্দ্রিকতার মানে এই নয় যে, সবকিছুকে অবহেলা করবেন; আপনি একটা ভিখারির মতো জীবন-যাপন করবেন। আপনার ফোকাস থাকবে আল্লাহ। যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্পদ দেয়, তাহলে সেই সম্পদ আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করবেন। যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে খ্যাতি দেয়, তাহলে সেই খ্যাতি আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করেন। যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ক্ষমতা দেয়, তাহলে সেই ক্ষমতা আপনি আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করুন।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে সেরা দৃষ্টান্ত তথা যার সবকিছু আল্লাহ কেন্দ্রিক ছিল, তিনি হলেন- সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ ﷺ। আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ কেন্দ্রিক হওয়ার সবচেয়ে সেরা উদাহরণ। তিনি শুধু মুসলিমদের জন্য রহমত নন; বরং পুরো মানব জাতির জন্য রহমত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-১০৭)

যে মানুষটার জীবনের উদ্দেশ্যটা সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত হতে পারে তিনি হলেন মুহাম্মদ ﷺ। যিনি একটি অসভ্য জাতিকে সুসভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যে মানুষটা পুরো মানুষ জাতিকে বদলে দিয়েছেন।

যদি তাঁর জীবনী নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দেয়া যেতে পারে। মুসলিমরা নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, সেগুলো বাদ দেন আপনারা।

অমুসলিমদের বলা কয়েক শত মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিতে পারি; যারা নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রশংসা করেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

জর্জ বার্নার্ড শ' : নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ' বলেছেন- তাঁকে নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমার মতানুযায়ী তাঁকে খ্রিস্টবিরোধী না বলে বলা উচিত, 'মানব জাতির জন্য একজন রক্ষাকারী।

থমাস কার্লাইল : বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল। তিনি ছিলেন ইউরোপীয়ান অমুসলিম। তিনি একটি বই লিখেছিলেন- যেখানে তিনি বিশ্বের বিখ্যাত হিরোদের নাম দিয়েছিলেন। আর সেখানে যিনি এক নম্বর হিরো ছিলেন- তিনি একজন রাসূল। তিনি ঈসা (আ) নন, মুসা (আ) নন, দাউদ (আ) নন, তিনি হলেন নবী মুহাম্মদ ﷺ। চিন্তা করুন, থমাস কার্লাইল একজন ইউরোপী খ্রিস্টান, তিনি যাকে তার বইয়ের এক নম্বর হিরো হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি হচ্ছেন- মুহাম্মদ ﷺ।

লা মার্টিন : ফ্রান্সের লা মার্টিন ছিলেন বিখ্যাত একজন ঐতিহাসিক। তিনি বিভিন্ন বই লিখেছেন, তিনি তুর্কিদের ইতিহাস লিখেছিলেন। লা মার্টিন বলেছেন, যদি কোনো উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য সামর্থ্যের ক্ষুদ্রতা আর বিস্ময়কর ফলাফল এই তিনটা ক্ষেত্র দিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে আধুনিক ইতিহাসে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে, যিনি নবী মুহাম্মদ ﷺ এর কাছাকাছিও আসতে পারে। মার্টিন আরো বলেছেন, মানুষের জীবনে সব মানদণ্ডেই নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছাকাছি আসার মতো কেউ নেই।

মাইকেল এইচ হার্ট : বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ হার্ট। তার লেখা একটি বই 'মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তি"। আদম (আ) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত তার এই তালিকায় এক নম্বরে আছেন নবী মুহাম্মদ ﷺ। আদম (আ) থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ হলেন- নবী মুহাম্মদ ﷺ। আর কেউ নন।

তিনি আরো লিখেছেন, আমি যে মুহাম্মদ ﷺ কে এক নম্বরে বসিয়েছি এটা দেখে অনেকেই অবাক হবেন। অনেকেই হয়তো এই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারবেন না। তবে আমি নবী মুহাম্মদ ﷺ কে এক নম্বর ব্যক্তিত্ব হিসেবে বেছে নিয়েছি তার কারণ, তিনি ইতিহাসে একমাত্র মানুষ যিনি ধর্মীয় ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন, পার্থিব জীবনেও সফল হয়েছেন।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা : এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় নবী মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ﷺ হলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সফল ধর্মীয় নেতা। চিন্তা করুন, এটা বলেছে- এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা। অবশ্য এটা না লিখে তাদের উপায় ছিল না। এটাতো একটা বিশ্বকোষ; তাই এদেরকে সত্য কথাটা অবশ্যই বলতে বা লিখতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا -

অর্থ : বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।

(সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ -

অর্থ : তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সূরা আল কালাম : আয়াত-৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উল্লেখ করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ

وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

(সূরা আহযাব : আয়াত-২১)

নবী মুহাম্মদ ﷺ, তিনি জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রেই সফল হয়েছিলেন। শুধু ধর্মীয়ভাবে নয়; বরং রাজনীতিক হিসেবে সফল ছিলেন।

তিনি এতোটাই সফল ছিলেন যে, তাঁর সবগুলো কাজকেই অনুসরণ করা যায়। তিনি যা করতেন, সেগুলো করলে ইনশাআল্লাহ আপনিও পুরস্কার পাবেন। নবী ﷺ তাঁর পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড় পরতেন। যদি গোড়ালির ওপর আপনি কাপড় পরেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনি পুরস্কার পাবেন। আবার যদি বিজ্ঞানী হতে চান, তবে লম্বা চুলে লাভ হবে না, জুতা পরেও লাভ নেই, জামা-কাপড়েও

লাভ নেই। তবে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো হতে চান। তিনি যা কিছু করেছেন। যদি অনুসরণ করেন, তাহলে উপকার হবে; ইহকালেও হবে, আখেরাতেও হবে। নবী ﷺ বলেছেন- "মুখে দাড়ি রাখো"। যদি আপনি দাড়ি রাখেন ইনশাআল্লাহ এতে উপকার হবে। আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু করেছেন, তিনি জীবনের সবগুলো ক্ষেত্রে সফল ছিলেন । তিনি হলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুমিন।

ইসলামে ইতিহাসে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আল আশারা মুবাশশারা। নবী ﷺ বলেছেন, এই দশ ব্যক্তি বেহেশতে যাবে। সুনান আত তিরমিযির ৪ নম্বর খণ্ডের ১১৭১ নম্বর হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে- সেখানে নবী ﷺ বলেছেন, এই দশ ব্যক্তি বেহেশতে যাবে।

১. আবু বকর ইবনে কুহাফা, ২. ওমর ইবনে খাত্তাব,
৩. ওসমান ইবনে আফফান, ৪. আলি ইবনে আবু তালিব,
৫. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, ৬. যুবাইর ইবনে আওয়াম,
৭. আবদুর রহমান ইবনে আউফ, ৮. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস,
৯. সাঈদ ইবনে যায়েদ, ১০. আবু আল ইবনে যাওয়াদ।

এই দশ ব্যক্তিকে নবী মুহাম্মদ ﷺ জান্নাতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাদের জীবনকথা আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। আজকে সময় কম তাই বিস্তারিত বলছি না। ইসলামে মহিলাদের মডেলও আছেন। সবচেয়ে সেরা দৃষ্টান্ত হচ্ছেন মরিয়াম, যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা আলাইহিস সালামের মা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَٰلَمِينَ.

অর্থ : স্মরণ করো, যখন ফিরিশতারা বলেছিল, 'হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত আর পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন। (সূরা আল ইমরান : আয়াত-৪২)

এছাড়াও আরেক জন আছিয়া। তিনি ছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থ : আল্লাহ মুমিনদের জন্য দিচ্ছেন ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল : 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার করো ফিরাউন ও তার দুষ্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করো জালিম সম্প্রদায় হতে। (সূরা তাহরীম : আয়াত-১১)

আছিয়া তার যাবতীয় সম্পদের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে চেয়েছেন, আল্লাহর কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। তিনি তখন এই পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী লোকের স্ত্রী ছিলেন। পৃথিবীতে সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষের স্ত্রী ছিলেন তিনি।

এছাড়া বলা যায় খাদিজা (রা)-এর কথা। তিনি ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী। এছাড়াও ফাতেমা (রা) যিনি ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর কন্যা। তাঁরা হলেন- মহিলাদের মধ্যে রোল মডেল। আপনারা শ্রেষ্ঠ দম্পতির দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন মহানবী ﷺ আর খাদিজা (রা)-এর দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে সবচেয়ে খারাপ দম্পতির দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন আবু লাহাব এবং তার স্ত্রীর মধ্যে।

তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা লাহাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ط مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ط سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ج وَامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ج فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ -

অর্থ : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। অচিরেই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে এবং তার স্ত্রীও- যে ইন্ধন বহন করে, তার গলদেশে হবে পাকানো রজ্জু। (সূরা লাহাব : আয়াত-১-৫)

এছাড়াও আল্লাহ নূহ (আ) ও লুত (আ)-এর স্ত্রীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের উল্লেখ করেছেন–

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লুতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লুত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি এবং তাদের বলা হলো 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো।' (সূরা তাহরীম : আয়াত-১০)

আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন- দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাসীকে আল্লাহ তায়ালা বেশি ভালোবাসেন। আমাদের বর্তমান সময়ে এরকম অনেক মানুষ আছে। এদের একজন শেখ আব্দুল্লাহ বিন আযযাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তাঁর সামর্থ্য কম ছিলো; চোখে দেখেন না, অন্ধ। তারপরও তিনি বর্তমান বিশ্বের সেরা বিশেষজ্ঞদের একজন। আমি আপনাদেরকে শেখ আব্দুল্লাহ আযযামের কথা বলেছি।

আরো একজনের উদাহরণ দেই। তবে যদিও সে ততটা বড় নয়, তবে আলাদা। সেটা আমি নিজেই। আমার জীবনের উদাহরণটা যদিও দেওয়ার মতো নয়, তবে আমি আলাদা। আমি আগে তোতলা ছিলাম। কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে আমি বলতাম- আমার নাম জা-জা-জাকির। আমি ছোটবেলা থেকেই তোতলা ছিলাম। শেখ দিদাত আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এর আগে কিন্তু মেডিকেলে পড়েছি। স্বপ্ন দেখতাম পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ডাক্তার হবো। কিন্তু পঁচিশ জন মানুষের সামনে লেকচার দিচ্ছি, এটা কল্পনাও করতে পারতাম না।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। এখন আল্লাহর এই বান্দা, মাশাআল্লাহ! এখন আমি হাজারো মানুষের সামনে, লাখ লাখ মানুষের সামনে কথা বলি; মাশাআল্লাহ। আজকে এখানে প্রায় এক লাখ মানুষ এসেছেন। আহমেদ দিদাতকে দিখে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি প্রতিষ্ঠা করলাম

ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন। আমি নিজে বক্তা হওয়ার জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করিনি; যাতে করে এখান থেকে বক্তা তৈরি করতে পারি, সে জন্য এটি প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি বক্তা হতে পারবো না। তাই বক্তা তৈরি করার একটা প্রতিষ্ঠান বানালাম। আল্লাহ এখানে প্ল্যান করলেন। প্রথম বক্তা যখন ঘাবড়ে গেলেন। আমি বাধ্য হয়ে স্টেজে গেলাম।

তখন খেয়াল করলাম- যখন আমি অমুসলিমদের দাওয়াত দিচ্ছি, তখন আমি তোতলাচ্ছিনা। মুসলিমদের সাথে কথা বলতে গিয়ে তোতলাচ্ছি। যেখানে স্টেজে সাধারণ মানুষই গিয়ে তোতলায়, সেখানে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর দয়ায় স্টেজে উঠলে আমি তোতলাই না। এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ রহমত। আল্লাহ আমাকে শরীরের ডাক্তার থেকে আত্মার ডাক্তার বানিয়েছেন। আমি শেখ দিদাতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল ১৯৮৭ সালে আমি ছিলাম তার ড্রাইভার। আমি এজন্য তাঁর গাড়ি চালাচ্ছিলাম যেন উনার সাথে বেশি সময় অবস্থান করতে পারি।

আমি বললাম- "আংকেল এতো আত্মমগ্ন কেন?" তিনি বললেন- "বাবা আমি আত্মমগ্ন নই, আমি যুদ্ধ করছি শয়তানের সাথে। যুদ্ধ করার দুইটি অস্ত্র আছে; একটি হচ্ছে- পবিত্র পানি আর অন্যটি 'আগুন'। আমি 'আগুন' বেছে নিয়েছি।" আমি যখন দাওয়া শুরু করলাম তখন তার কথাগুলো বলতাম, কিন্তু সেটা বলতাম, খুবই নরম আর ভদ্রভাবে। কোনো কাজ হলো না। মেডিকেল কলেজে দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলাম। তারপর যুদ্ধ শুরু করলাম অত্যন্ত আত্মমনোযোগসহ। এতে করে আলহামদুলিল্লাহ! কাজ হয়ে গেল। আমি লেকচার শুরু করলে আমার মুসলিম বন্ধুরা পালিয়ে যেত, আর যারা বসে থাকতো তারা সবাই অমুসলিম।

আমি আত্মমগ্ন হয়ে কাজ করে ফল পেলাম। তখন আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করলেন। স্টেজে আমি আবার নরম হলাম। আমি এতোটাই নরম হলাম যে, প্রশ্নকারীরা অপমানজনক কথা বললেও আমি হাসতাম। শেখ দিদাত, তিনি তখন আমাকে টাইটেল দিলেন। প্রথমে তিনি বলেছিলেন 'দিদাত প্লাস'। তারপর সব দেখে বললেন, ওরা তোমাকে অপমান করছে, তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছে; আর তুমি হাসছো? তখন তিনি একটা উপহার দিলেন। তিনি বললেন যে, "বাবা আমার যেটা অর্জন করতে ৪০ বছর সময় লেগেছে; তুমি সেটা ৪ বছরে অর্জন করেছো।" আলহামদুলিল্লাহ।

আপনারা যদি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে থাকেন তবে দেখবেন, আমি.জীবনে সব সময় সেরা জিনিসগুলোই চেয়ে এসেছি; সেকেন্ড হওয়াটা আমি কখনো পছন্দ করিনি। আমার ছোট বেলার কথা মনে আছে। সেরা ইলোকটনিক। এখন আমি এই ইচ্ছাটাকে বদলে ফেলে আল্লাহর পথের সেরা কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছি। ক্যামেরা চাইলে সেরা ক্যামেরাটাই চাইতাম। সেরা যন্ত্রপাতি, একেবারে অত্যাধুনিক। এখন আল্লাহর বাণী প্রচারের জন্য সেরা কনফারেন্সের আয়োজন করেছি। সেই জন্য আজকের এই অনুষ্ঠান।

পৃথিবীতে এরকম অনুষ্ঠান চালু আছে । যেমন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড, অস্কার অ্যাওয়ার্ড ইত্যাদি। এসবগুলোর উদ্দেশ্যটা হারাম কিন্তু সেখানকার বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিটা ভালো। আমরা ভাবলাম, আল্লাহ তায়ালার খাতিরে এ ধরনের প্রচার করা যাবে না কেনো? এখানে উদ্দেশ্যটা আলাদা; উদ্দেশ্যটা হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। পুরো পৃথিবীটাকে দেখিয়ে দেব যে, আমরা মুসলিম। আলহামদুল্লিাহ আমরাও পারি। তবে এমন নয় যে, এটা ছাড়া দাওয়ার কাজ হবে না। তবে আমরা দেখাতে চেয়েছি, আমরা আল্লাহ তায়ালার পথে সেরা কাজটা করবো। আমাদের অফিসটাকেও তাই বানিয়েছি সেরা অফিস।

মানুষ সাধারণত নিজের বাসায় ইটালি মার্বেল বসায়, কিন্তু আমি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন অফিসে এই মার্বেল বসিয়েছি। আমার বাসায় কোনো ইটালি মার্বেল নেই। কারণ যেখানে মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে জানতে আসবে, সেখানে যেন সেরা জিনিসই থাকে। সে সময় ১৯৯০ সালের দিকে কোনো মুসলিম অফিসে ইটালিয়ান মার্বেল একরকম দেখাই যেতো না। ছোটো থেকে শুরু, আমাদের প্রথম অফিসটা ছিলো মাত্র ২০ থেকে ২৫ স্কয়ার মিটার; মাত্র ২৫ স্কয়ার মিটার অফিস ছিল। আর সে অফিসে কাজ করতো মাত্র একজন লোক। এখন মাশাআল্লাহ! আমাদের অফিসে ৪০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন।

এটা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দাওয়া ফাউন্ডেশন। সব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত। স্কুলের বিতর্কে আমি খুব ভালো ছিলাম; তবে তখন উদ্দেশ্য ছিলো বিতর্কে বিজয়ী হওয়া। এখন উদ্দেশ্য বদলে ফেলেছি। এখন আমি দ্বীনের কথা প্রচার করি; যেটা দ্বীনুল হক তথা সত্যের পথ। এতে অবশ্য আমি ভালো ফলও পেয়েছি। মেডিকেল কলেজে থাকতে আমি দিনে ৫/৬ ঘণ্টা ঘুমাতাম; আর এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার খাতিরে মাত্র ৩ ঘণ্টা ঘুমাই। আর আমার সবসময় লক্ষ্য ছিল যে, আমি আলাদা কিছু করবো; নয়তো সেরা কাজটাই আমি

বেছে নেব। আমি এজন্য আলাদা একটি টিভি চ্যানেল করলাম- যার নাম দিলাম 'পীস টিভি'। আল্লাহ আমাদের এই চ্যানেলকে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল বানিয়েছেন। আমাদের দর্শক-শ্রোতা ১০ কোটিরও বেশি, মাশাআল্লাহ। এর কয়েক দিন পরে আমরা নতুন আরো একটি চ্যানেল খুলেছি; 'পীস টিভি উর্দু"। গত কনফারেন্সে আমি বলেছিলাম- 'ইনশাআল্লাহ জুন অথবা জুলাই মাসে আমরা পীস টিভি উর্দু' চালু করবো; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সেটা কবুল করে নিয়েছিলেন। এ বছরের জুন মাসের ১৯ তারিখে 'পীস টিভি উর্দু' চালু করেছি আমরা।

আর এবারের কনফারেন্সে আমি আপনাদের বলছি– 'ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যদি সাহায্য করেন তাহলে আমরা নতুন আরো একটা চ্যানেল খুলবো- 'পীস টিভি বাংলা' (ইতোমধ্যে ২০১০ সালে 'পীস টিভি বাংলা' চালু হয়েছে। - অনুবাদক)। কারণ, বাংলাভাষায় মাশাআল্লাহ! পৃথিবীর প্রায় ৩০ কোটি মানুষ কথা বলে। তাই এটা প্রয়োজন। আমার ইচ্ছা আছে- ইসলামিক চ্যানেল হবে সবগুলো ভাষাতেই।

আমার ইচ্ছা ছিল- এই টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করবো যেখানে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের ওপরে ট্রেনিং দেওয়া হয়। এটা ভেবে তখন চালু করলাম 'ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল'। উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে পরকালে পুরস্কার দেবেন; ইহকালেও আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

এরকম ইচ্ছা নিয়েই স্কুলটা চালু করলাম। আর আলহামদুলিল্লাহ! এ স্কুলের প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রী অর্থাৎ বোম্বে শাখায় প্রায় ৪০০ জন এবং চেন্নাইতে প্রায় ২৫০ জন তাদের সকলেই ডা. জাকির নায়েকের চেয়ে ১০০ গুণ ভালো শিক্ষা আর পড়াশোনার পরিবেশ পেয়েছে। তবে এখন আল্লাহই ঠিক করবেন- এখান থেকে জাকির নায়েক বের হবে কি না। তবে আমার ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে একটা সুযোগ করে দেয়া যে, এখানে যেন তারা আমার চেয়ে আরো ভালো শিক্ষা আর পড়াশোনার পরিবেশটা পায়। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সাহায্য করলে সেটা সম্ভব।

আমি এখানে আরো একটা উদাহরণ দেব। আমার ছেলে ফারিক নায়েক; মাশাআল্লাহ! এক লেকচারে আমি তার সম্পর্কে বলেছিলাম। আমি আরবি ভাষা

জানি না; তখন বলেছিলাম আমি আমার ছেলেকে আরবি ভাষা শিক্ষা দেব। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্কুলের সব ছাত্র/ছাত্রী আরবি ভাষা জানে। আমার ছেলে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের স্কুলের সেরা খেলোয়ারের পুরস্কারটা পেয়েছে। একবার নয়, দুইবার নয়, তিন বার নয়, চার বার নয়, সে পাঁচ পাঁচবার স্কুলের সেরা খেলোয়ার হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। আমি তাকে উৎসাহ দিয়েছি। কারণ, আমার ভালো লেগেছিল।

আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন এগুলো আমার খুব ভালো লাগতো। আমি দৌড়ে প্রথম হবো, গোল্ড মেডেল পাবো, এটা ভাবতেই তো ভালো লাগতো। সবাই ভাবতো! ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে। স্কুলে আমি কখনও মেডেল পাইনি। তারপর কলেজে উঠে আমি বুঝতে পারলাম যে, মাশাআল্লাহ! আমি দূরপাল্লার দৌড়ে ভালো। মেডিকেল কলেজে আমি গোল্ড মেডেল পেলাম ১০ কিলোমিটার দৌড়ে। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, গোল্ড মেডেল মূল্যহীন; দূর থেকে দেখলে তা ভালোই; কিন্তু গোল্ড মেডেল দিয়ে কী হবে? দৌড়ে প্রথম হয়েছি, মেডেল পেয়েছি; ব্যস হয়ে গেল।

তারপর শেখ দিদাতকে দেখলাম। বুঝলাম, এই তো আসল মানুষ। এরপর আমার ফোকাস বদলে গেল। তিনি তখন আমাকে বললেন যে, বাবা! আমি খ্রিস্টান ধর্মের সাথে ইসলামকে তুলনা করে রিসার্চ করেছি। তুমি অন্য ধর্মগুলো রিসার্চ করো। শেখ দিদাত তার কাজগুলো এতো ভালোভাবে করেছেন যে, শেখ দিদাতের বইগুলো পড়লে আপনি সব রেডিমেড পেয়ে যাবেন আর খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের সাথে বিতর্ক করতে পারবেন। তখন আমি পড়লাম হিন্দু ধর্ম, শিখ ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাসসহ অন্যান্য সাবজেক্ট।

মাশাআল্লাহ! আমি শুনেছিলাম শেখ দিদাতের একটি বিতর্কে সবচেয়ে বেশি লোক এসেছিল বার্মিংহামে। সেখানে উপস্থিত হয়েছিল ১২ হাজার মানুষ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমার পথ খুলে দিলেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় মাশাআল্লাহ! আমার ছেলে কুরআনে হাফেজ হয়েছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সে পবিত্র কুরআন হিফজ শেষ করেছে। দিনে ১ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৫ দিন করে সে এই কুরআন অধ্যয়ন করেছে। লোকজন বলতো, জাকির পাগল হয়ে গেছে। প্রতিদিন ১ ঘণ্টা করে তাও আবার সপ্তাহে ৫ দিন; এটা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের স্কুলের অধিকাংশ ছাত্র/ছাত্রী আড়াই থেকে ৪ বছরে হাফেজ হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। তাদের মধ্যে একজন আমার ছেলে।

এরপর আমার ছেলে তায়কোয়ান্দোতে ব্ল্যাকবেল্ট পেয়েছে। তবে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি যখন সে পাবলিক সমাবেশে লেকচার দেওয়া শুরু করেছে। ৮ বছর বয়সে ছোট লেকচার দিত, যেমন ১৫ মিনিট। আমার লেকচারের আগে তাকে একটু সময় দেওয়া হতো, আর সে কিছু কথা বলতো।

আমি যখন প্রথম পাবলিক লেকচার দিই, সেটা ছিল আমার ২৭/২৮ বছর বয়সে। লোকজন বলতো, মাত্র ২৮ বছর বয়সে ছেলেটা লেকচার দিচ্ছে? তারা আশ্চর্য হতো। শেখ দিদাত ৬০/৭০ বছর বয়সে লেকচার দিচ্ছেন আর এর বয়সতো অনেক কম!

আর আমার ছেলে প্রথম যেদিন বড় লেকচারটা দিয়েছে সেটা ছিল সোয়া ১ ঘণ্টারও বেশি। সেখানে সে ১১৯টি উদ্ধৃতি দিয়েছে। তারমধ্যে ৫৬টা কুরআন থেকে, ৫২টা বাইবেল থেকে আর ১১টা হাদীস থেকে। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। যা আমার প্রথম লেকচারের সময়ে বয়সের তুলনায় অর্ধেক। আর সে এই ১১৯টা উদ্ধৃতি দিয়েছিল কোনো নোট ছাড়াই। সে গত সপ্তাহে একটি লেকচার দিয়েছে; আগামি সপ্তাহেও একটি লেকচার দেবে। ইনশাআল্লাহ, আমি দোয়া করছি- আমার ছেলের প্রচেষ্টা যেন সফল হয়।

আমি সবসময়ই আমার ছেলেকে বলি- আল্লাহ তোমাকে সামর্থ্য দিয়েছেন, এখন তোমার নিজের চাহিদাটা কমিয়ে ফেলো। কারণ, আগামীকাল এসব কিছু না-ও থাকতে পারে। তোমার উদ্দেশ্য হলো দাওয়াত দেয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ : কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিম (অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত)।

(সূরা হা-মীম আস সাজদা : আয়াত-৩৩)

আমার মনে আছে, বিয়ে করার সময় আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম- "আমি পেশায় একজন ডাক্তার। আমি প্রতি মাসে তোমাকে ৪ হাজার রুপি করে দিতে পারবো। এখন চাইলে আমাকে বিয়ে করতে পারো আর চাইলে না-ও করতে পারো। মাশাআল্লাহ! আমার স্ত্রী তখন কলেজের টিচার। সে আরো বেশি উপার্জন করতো। সে তাই এটাতেই রাজি হয়ে গেল।

এজন্য আমার ছেলেকে বলেছি, তোমার চাহিদা কমিয়ে ফেল। যদি তুমি মেঝেতে বসে থাকায় অভ্যস্ত হও, যদি তুমি কষ্ট করায় অভ্যস্ত হও, সবকিছু ত্যাগ করে যদি দাওয়াত দিতে পারো; সেটা অনেক সহজ। কিন্তু যদি আরাম আয়েশে অভ্যস্ত হও। তাহলে সেই আরাম-আয়েশ তোমাকে দাঈ হওয়ার পথে বাধা দেবে। মাশাআল্লাহ! আমার ছেলে মেঝেতে ঘুমিয়ে অভ্যস্ত; তবে সে সেভেন স্টার হোটেলেও থেকেছে। তবে আমার মতে, তরুণ বয়সে সবাইকে কষ্ট করতে হয়। আপনাদের সন্তানদের মুখে সোনার চামচ তুলে দেবেন না; তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা কঠিন হয়ে যাবে।

সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তার সময়কাল

জীবনের বিভিন্ন স্টেজে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের এই উদ্দেশ্যটা যেন সঠিক থাকে। আমি আরো একটি পয়েন্ট বলি। যখন আমাদের স্কুলে কাউকে ভর্তি করা হয়, তখন বাবা-মাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সবচেয়ে সেরা কোন সময়টা, সবচেয়ে লেটেস্ট কোন সময়টা, যে সময় আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবেন? এর জবাবে কেউ কেউ বলেছে- যখন সে কলেজে যাবে, আবার কেউ কেউ বলেছে- যখন সে স্কুলে ভর্তি হবে, অনেকে বলেছে- না, সে যখন কিন্ডার গার্টেনে ভর্তি হবে। কেউ উত্তরে আমাকে এর আগের সময়ের কথা বলেনি।

ইসলামিক নিয়মে একেবারে লেটেস্ট যে সময়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববেন সেটা হচ্ছে- যখন আপনি বিয়ে করবেন তথা আপনার জীবন সঙ্গীকে বেছে নেবেন। যখন আপনার জীবন সঙ্গীকে বেছে নেবেন, তখন চিন্তা করবেন যে, আপনার সন্তান কী হবে। কারণ, সন্তানের বাবা এবং মা, এরাই সেরা শিক্ষক। শুরুতেই প্ল্যান করতে হবে। এটা একেবারে লেটেস্ট। এ সময় থেকেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করবেন।

একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করবে সেটা আর একবার সংক্ষেপে বলছি–

১. সন্তানকে যখন পড়াশোনা করাবেন তখন খেয়াল রাখবেন, সে যেন এমন কোনো স্কুল বা কলেজে লেখাপড়া করে, যেখানে আখেরাত আর পৃথিবী, দুটোর ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। শুধুমাত্র ইহকালের ডিগ্রি দিয়ে কোনো লাভ হবে না। এমন স্কুলে পড়াবেন, যেখানে ইহকাল এবং পরকাল দুটোকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২. খেয়াল রাখবেন, তার বন্ধুদের জীবনের উদ্দেশ্যও যেন একই রকম হয়। বন্ধুরাও যেন ইসলামিক হয়। তাহলে তারা বড় হয়ে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে, যাদের উদ্দেশ্য হবে কুরআন এবং সহীহ হাদীসের ওপর ভিত্তি করে।

৩. **অর্গানাইজেশ**নে যোগ দেন; কিন্তু যোগ দেওয়ার আগে যাচাই করে নেন যে, **সেই অর্গা**নাইজেশনটা কুরআন অনুযায়ী, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নির্দেশ আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথে চলছে কি না।

৪. যখন পেশা বেছে নেবে তখন কুরআনের এই আয়াত অনুযায়ী কাজ করবে। অর্থাৎ সে যেন এমন পেশায় থাকে, যা তাকে আল্লাহর পথে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : তোমাদের মধ্যে এমন একদল মানুষ আসুক, যারা লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। এই মানুষগুলো সফলকাম হবে।
(সূরা আল ইমরান : আয়াত-১০৪)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা উল্লেখ করেছেন–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ : কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিম (অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত)।
(সূরা হা-মীম আস সাজদা : আয়াত-৩৩)

আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী প্রচার করাটাই সবচেয়ে উত্তম পেশা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে।

৫. এমন জীবন সঙ্গী বেছে নেবে, যার জীবনের উদ্দেশ্যও একই রকম; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তাঁর রাসূল। অর্থাৎ তার জীবনের উদ্দেশ্যও হবে আল্লাহ কেন্দ্রিক।

আমার লেকচার শেষ করার আগে আমি পবিত্র কুরআনের আরেকটি উদ্ধৃতি দেব।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

বল, আমার সালাত, আমার কুরবানী ও হজ, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। (আল আনআম : আ.-১৬২)

সমাপ্ত

পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
১.	THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি)	১২০০
২.	VOCABULARY OF THE HOLY QURAN	২০০
৩.	বিষয়ভিত্তিক আল কুরআনের অভিধান	
৪.	কিতাবুত তাওহীদ —মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব	১৫০
৫.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-১ কুরআন ও হাদীস সংকলন —মো: রফিকুল ইসলাম	৪০০
৬.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-২ লা-তাহযান হতাশ হবেন না —আয়িদ আল কুরনী	৪০০
৭.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৩ বুলূগুল মারাম —হাফিয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহ:)	৪০০
৮.	বিষয়ভিত্তিক সিরিজ-৪, সহীহ হাদীস প্রতিদিন বুখারী মুসলিম হাদীস সংকলন	
৯.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির —মো : নূরুল ইসলাম মণি	২১০
১০.	নামাজের ৫০০ মাসয়ালা —ইকবাল কিলানী	১৫০
১১.	সহীহ মুকসূদুল মুকমিনীন	৪০০
১২.	সহীহ নেয়ামুল কুরআন	৪০০
১৩.	সহীহ আমলে নাজাত	২২৫
১৪.	রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায —মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী	২২৫
১৫.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	১৪০
১৬.	রিয়াযুস স্বা-লিহিন —যাকারিয়া ইয়াহইয়া	৬০০
১৭.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টা —মো : নূরুল ইসলাম মণি	৪০০
১৮.	নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় — আল্ বাহি আল্ খাওলি (মিসর)	২১০
১৯.	জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২০০
২০.	জান্নাতী ২০ (বিশ) সাহাবী —মো : নূরুল ইসলাম মণি	২০০
২১.	রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন —সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৪০
২২.	সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন —মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম	২২০
২৩.	রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা —মো: নূরুল ইসলাম মণি	২২৫
২৪.	রাসূল ﷺ জানাযার নামাজ পড়াতেন যেভাবে —ইকবাল কিলানী	১৩০
২৫.	জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা —ইকবাল কিলানী	২২৫
২৬.	মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) —ইকবাল কিলানী	২২৫
২৭.	কবরের বর্ণনা (সাওয়াল জওয়াব) —ইকবাল কিলানী	১৫০
২৮.	বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী —সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান	১৫০
২৯.	দোয়া কবুলের পূর্বশত —মো: মোজাম্মেল হক	১০০
৩০.	ড. বেলাল ফিলিপস সমগ্র	৩৫০
৩১.	ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন — ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী)	৭০
৩২.	জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ	১৫০
৩৩.	ফাজায়েলে আমল	
৩৪.	কবিরা গুনাহ্	২২৫
৩৫.	দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলির ৫০টি সমাধান	১২০
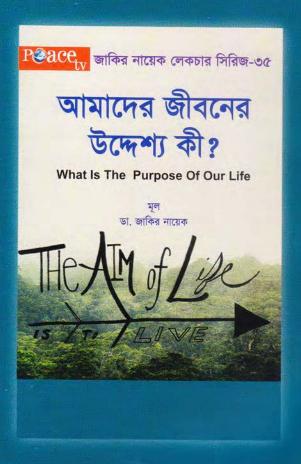
পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫